আধুনিক মানসিকতা
ও
বিদ্যাসাগর

সন্তোষ কুমার অধিকারী

। প্রাপ্তিস্থান ।
এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স্ প্রাঃ লিমিটেড
১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট্
কলিকাতা-৭৩

প্রকাশ : ১৯৫৯
বিদ্যাসাগর রিসার্চ সেণ্টার
৮১, রাজা বসন্ত রায় রোড। কলিকাতা-২৯ থেকে
ডা: জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক
প্রকাশিত

প্রচ্ছদ :
শ্রীদিগম্বর দাশগুপ্ত

মুদ্রক :
ভবানীপুর আর্ট প্রেস, ৮০, আশুতোষ মুখার্জি রোড,
কলিকাতা-২৫

শ্রীগৌতম ভট্টাচার্য
শ্রীপার্থসারথি চট্টোপাধ্যায়
কল্যাণবরেষু—

এই লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ :

বিদ্যাসাগর
শহীদ যতীন দাস ও
ভারতের বিপ্লব আন্দোলন
সন্ত্রাসবাদ ও ভগৎ সিং
বিদ্যাসাগরের শেষ ইচ্ছা

কাব্যগ্রন্থ :
দিগন্তের মেঘ
অন্য কোনখানে

উপন্যাস :
রক্ত কমল
নির্জন শিখর

Vidyasagar and
the Regeneration of Bengal
Blossoms in the Dust.

আধুনিক মানসিকতা ও বিদ্যাসাগর গ্রন্থের ভূমিকা

ঊনবিংশ শতাব্দী বাংলার সমাজের ইতিহাসের এক তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাংলার শাসকের পদে অধিষ্ঠিত হবার ফলে আমাদের জরাজীর্ণ, অন্ধ সংস্কার নিপীড়িত সংস্কৃতির সহিত পশ্চিমের প্রাণবান, যুক্তিবাদী নূতন সংস্কৃতির সংঘাত ঘটে। ফলে আমাদের সমাজের মরা গাঙ্গে বান আসে, আমাদের ঘুম ভাঙে এবং মধ্যযুগের অচলায়তন ভেঙে নূতন সমাজ গড়ে ওঠে। সমাজের সকল স্তরে তা নূতন প্রাণ সঞ্চার করে। এই সর্বাত্মক অভ্যুদয়কে 'বাংলার রেণেসাঁস' বলা হয়। বাঁধ ভেঙে মরাগাঙে নূতন প্রাণের বন্যা প্রবাহিত করার কাজে যাঁরা মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁদের অন্যতম।

তাঁর ভূমিকার মূল্যায়ন আলোচ্য গ্রন্থের উপজীব্য। এই মূল্যায়ন একটি অভিনব দৃষ্টিকোণ হ'তে স্থাপিত হ'য়েছে। লেখকের প্রথম প্রতিপাদ্য হ'ল সাধারণ মানুষের মন সক্রিয়, তাই সমাজের বিধি ব্যবস্থা যুক্তিসম্মত না হ'লেও যন্ত্রের মত মেনে চলে। যখন জরাগ্রস্ত হ'য়ে সমাজ অন্ধ সংস্কারের নাগপাশে বদ্ধ হয়, তখন মুক্তি আসে সমাজেরই সক্রিয় ব্যক্তিত্ববিশিষ্ট কোনও প্রাজ্ঞ নেতার নেতৃত্বে। বিদ্যাসাগর মহাশয় এখন একটি দুর্লভ মানুষ। অন্য সক্রিয় ব্যক্তিত্ব-বিশিষ্ট সমধর্মী মানুষও যে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সে কথা স্বীকৃত। তবে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভূমিকা নানাভাবে বিশিষ্ট। তাঁর প্রভাব ব্যাপক এবং তাঁর অভিযান ধর্ম সম্বন্ধে নিরপেক্ষ মন নিয়ে, যুক্তি সম্মত পথে, দূরদর্শিতার আলোকে নিয়ন্ত্রিত হ'য়েছিল।

এই প্রতিপাদ্য লেখক কতকগুলি প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে আলোচ্য গ্রন্থে স্থাপন করেছেন। সমাজের পাঁচটি ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের

ভূমিকার অনন্যতাকে এই প্রবন্ধগুলিতে ফুটিয়ে তোলা হ'য়েছে। ধর্মের ক্ষেত্রে তিনি অন্ধবিশ্বাস এবং বিতর্ক এড়িয়ে চেতনাকে মানবিকতা-মুখী করতে চেয়েছেন। হিন্দুসমাজকে তিনি যুক্তির ভিত্তিতে নূতন করে গড়তে চেয়েছিলেন জাতিবৈষম্য অস্বীকার করে এবং নারীকে তার পূর্ণ অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করে। তাঁর শিক্ষানীতি শিক্ষার্থীর বিচারশক্তি এবং প্রকাশশক্তিকে বিকশিত করতে চেয়েছিল। জাতিয়তাবোধের ভিত্তি হল স্বাজাত্য বোধ। তিনি নিজের আচরণ দিয়ে তার বিকাশ ঘটাতে চেয়েছিলেন। স্বদেশী পোষাক, স্বদেশী চটি তাঁর নিত্য সঙ্গী। সর্বোপরি নূতন ঋজু, প্রাঞ্জল গদ্যরীতি সৃষ্টি করে তিনি বাংলো সাহিত্যের বিকাশের জন্য প্রশস্ত পথ রচনা করেছিলেন।

লেখক প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক। আরও বড় কথা তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কন্যার পৌত্র। উত্তর পুরুষ হিসাবে তিনি এই অনন্য সাধারণ পূর্বপুরুষের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করেন। তাই দেখি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চরিত্রের মহত্বের পরিচয় এমন নিষ্ঠার সহিত তিনি দিতে পেরেছেন। ফলে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির উপর নূতন আলোক-পাত হ'য়েছে। এই গ্রন্থের এইখানেই বিশেষ সার্থকতা।

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

সূচীপত্র

ভূমিকা

সমাজ বন্ধনীর রূপ নির্ণয় করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা দুটি বিপরীত মুখী সত্বার রূপ নির্ণয় করেছেন। প্রথমটি হ'ল নিষ্ক্রিয় ব্যক্তিসত্বা, যা সামাজিক নিয়মের অন্তর্ভুক্ত হ'য়ে যায়; যাকে গোষ্ঠির থেকে স্বতন্ত্র ক'রে কোন সময়েই পাওয়া যায় না। সমাজের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিশে গিয়ে এই সত্বা সমাজের প্রয়োজনে কাজ করে। মানুষ তখন সমাজের হাতিয়ার হয়, সামাজিক সংস্কার দিয়েই তার বিচার করা হয়। Etzioni-র ভাষায়—'The individual is almost completely absorbed in the society, responsive to it and accounted for by it.'

তবু মাঝে মাঝে এমন আর একটি সত্বার অস্তিত্বও লক্ষ্য করা যায়, যা সমাজকে কখনও অন্ধভাবে মেনে নিতে পারে না। তার আচার, ব্যবহার, রীতি নীতি ও নিয়মের চরিত্রকে যাচাই করে দেখে নিতে চায়।

এই বিশেষ সত্বাটি যখন সক্রিয় হ'য়ে ওঠে, তখনই সমাজের প্রচলিত ধারায় ব্যতিক্রম জাগে। মানুষের প্রয়োজনে সমাজের গতি নিয়ন্ত্রিত হয়। ওই সক্রিয় ব্যক্তিসত্বা গোষ্ঠির ওপরে আপন প্রভাব বিস্তার করে। ফলে প্রচলিত পথ ও বিশ্বাস ছেড়ে নতুন পথে চলা আরম্ভ হয়। সমাজের রূপান্তর ঘটার সুচনা দেখা দেয়।

এই গোষ্ঠিসচেতনতার মধ্যে আবার ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের প্রভাবই কার্যকরী হয়। ব্যক্তির চিন্তা, ধারণা এবং ভাবনা সমাজের রূপান্তর ঘটাতে সচেষ্ট হয়।

সামাজিক বিবর্তনের মূলে যে একটি গোষ্ঠি বা দল এবং ওই গোষ্ঠি বা দলের নেতৃত্বে যে একটি ব্যক্তিত্ব সচেতন থাকে, এর দ্বারা আমরা এক স্বতন্ত্র ভাবনায় পৌঁছোতে পারি। ব্যক্তির অর্থ এখানে এমন একজন মানুষ যিনি সমাজের অন্তর্ভুক্ত হ'য়েও স্বতন্ত্র। তাঁর দৃষ্টি অনাবিল বলেই গতিশীল; এবং গতিশীল বলেই মানবিকতার দিকে প্রসারিত। "It is here that we find the key to a secular conception of man—in the ability of men by changing their social combinations, to change themselves."

—Etzioni.

সমাজের স্বাভাবিক বিবর্তন এবং আধুনিকিকরণের মধ্যে অনেক প্রভেদ আছে। পরিবর্তনকে ইংরাজী ভাষায় evolution, transformation, acculturation, modernization, renaissance ইত্যাদি নানা শব্দে এবং নানা অর্থে সূচিত করা হ'য়েছে। রেনেশাঁস কথার মধ্যে চিন্তাধারার হঠাৎ পরিবর্তন এবং পুনরুজ্জীবনের ভাব প্রচ্ছন্ন। কিন্তু আধুনিকিকরণ বলতে যা বোঝায়, তা হ'ল বৃহত্তর মানবিক চিন্তাপ্রবাহের সঙ্গে দেশ বা সমাজ চিন্তার যোগসাধন। এর জন্য হয়ত প্রচলিত সংস্কার ভাঙতে হয়, চেতনাকে নতুন করে গড়ে নিতে হয়; হয়ত সমাজের কাঠামোর রূপ বদল করতে হয়। Lerner এর ভাষায় "Physical, social and psychic mobility underlies the dynamics of modernization." অর্থাৎ আধুনিকতার তত্ত্বে অন্তর্নিহিত রয়েছে প্রাকৃতিক, সামাজিক ও চেতনার সচলতা কথাটা ঘুরিয়ে বললে যা হয়,—কোন দেশ, জাতি বা সমাজের আধুনিকিকরণ তখনই শুরু হয়, যখন সেই দেশের মানুষের পরিবেশ এবং চিন্তাধারায় গতির সঞ্চার হয়। এই গতির অর্থ, সেই সমাজের ধর্ম এবং চেতনা সম্প্রসারিত হ'য়ে এক বিশ্বজনীন চেতনার দিকে অগ্রসর হ'বে। একে সাম্প্রতিক অর্থে বিপ্লব বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে। কিন্তু বিপ্লব সংঘটন করাতে গেলে গোষ্ঠি চেতনার উদ্বোধন ঘটাতে হয়। ব্যক্তিনেতৃত্বে সাময়িকভাবে সমাজ মানসের উদ্বোধন ঘটলেও, তা স্থায়ী নাও হ'তে পারে। কিন্তু ব্যক্তিমানসের চিন্তা ও নেতৃত্ব যে বিপ্লব সংঘটনের কাজে অপরিহার্য তা' অস্বীকার করার উপায় নেই।

[দুই]

ভারতবর্ষে হিন্দুসমাজ ও সমাজ চেতনার যে পরিবর্তন শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে ঘটেছে, তার মধ্যে গতিশীলতা ছিল না; ছিল রক্ষণশীলতা, সংকোচন ও অবক্ষয়। শিশু যদি উপযুক্ত পরিবেশে বেড়ে উঠতে না পারে, তবে সে রুগ্ন হ'বে; যার পরিণতিতে মৃত্যু। হিন্দু সমাজের অবক্ষয়ের কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়—

১। রাষ্ট্রীক অস্থিরতা ২। দীর্ঘ পরাধীনতা ৩। প্রবল আত্মরক্ষার তাগিদ, ফলে সংকোচন ৪। ধর্মচেতনায় বারবার আঘাত পড়ায় প্রতিরোধ রূপে শাস্ত্র, পুরাণ ও দেশাচারের আবির্ভাব

৫। শিক্ষার ক্ষেত্রে ধর্মান্ধতা ও দেশাচারের প্রাবল্য।

৬। পুরোহিততন্ত্রের প্রভুত্ব।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতবর্ষে সামাজিক বিবক্ষয় ও মৃত্যুর লক্ষণগুলি সবদিকেই সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠেছিল।

ভৌগোলিক প্রকৃতির দিকে চাইলে দেখা যায়, গোটা দেশটা টুকরো টুকরো রাজ্যে বিভক্ত। কোন একটা রাজ্য বা প্রদেশের সঙ্গে আর একটা রাজ্য বা দেশের কোন আত্মিক যোগ নেই। রাজনৈতিক দিক থেকে দেশ যখন বিচ্ছিন্ন, তখন সাধারণ মানুষ বহিরাগত হুন, তাতার ও আরব দস্যুদের লুঠতরাজ ও অত্যাচারে সন্ত্রস্ত। তারা বিপর্যস্ত মোগল ও পাঠান সম্রাট বা সুলতানদের শাসন ও শোষণে।

শাসককুলের সঙ্গে সাধারণ মানুষের কোন মানসিক যোগ বা ভাবের আদান প্রদান না থাকায়, মানুষের জীবনযাত্রা শুধু যান্ত্রিক নয়, বেদনাময় এবং ক্লিষ্ট হ'য়ে উঠেছিল। মুসলমান সুলতান এবং তাদের আমলাতন্ত্র এমনকি হিন্দু জমিদার বা জায়গীরদারের অত্যাচারে মানুষ যেমন পীড়িত, পুরোহিত তন্ত্রের প্রভুত্ব ও নির্যাতনে তারা তেমনি বিধ্বস্ত। এই পুরোহিততন্ত্র প্রায়ই শিক্ষিত না হওয়ায়, এবং আপন প্রভুত্বকে কায়েম করবার জন্য সচেষ্ট হওয়ায় তারা বেদ উপনিষদের বদলে লৌকিক শাস্ত্র ও দেশাচারের প্রতিষ্ঠা করেছে। দেখা গেছে সাংখ্য বা বেদান্তর পুরুষ বা ব্রহ্মার স্থান দখল করেছে কোটি কোটি দেবদেবী। আড়ম্বর শুরু হ'য়েছে লৌকিক দেবদেবীর পূজা ও অনুষ্ঠান নিয়ে।

মোট অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে, তা হ'ল—সমাজে সংস্কারের অক্টোপাশ, জাতিভেদ, ধর্মান্ধতা, সামাজিক নির্দয়তা এবং অশিক্ষার প্রসার।

অষ্টাদশ শতকের রাজনৈতিক পরিস্থিতি একবার আলোচনা করে দেখা যাক্।

শতাব্দীর প্রথম দশকেই ঔরংজেবের মৃত্যু; এবং তারপর মোগল সাম্রাজ্যের ছিন্নভিন্ন অবস্থা। তৃতীয় দশকে নাদীর শাহ এবং চতুর্থ দশকে আহমদ শা আবদালীর ভারত আক্রমণ, অবাধ লুঠন ও হত্যালীলা। ডাচ ও ইংরাজ বণিকেরা সপ্তদশ শতকের প্রথম থেকেই ভারতে বাণিজ্য শুরু করেছে। ১৬০০ খৃষ্টাব্দেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী মোগল সম্রাটের সনন্দ লাভ করে। ১৬৯০তে তারা কলকাতার প্রতিষ্ঠা করে; এবং কয়েক বছরের মধ্যেই গোবিন্দপুর ও সুতানটির জমিদারি লাভ করে। ১৭৫৭তে পলাশীর যুদ্ধে সিরাজউদ্দৌলাকে পরাজিত করে তারা বঙ্গদেশ দখল করে। ১৭৬৫তে ইষ্ট

ইণ্ডিয়া কোম্পানী বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করে। অষ্টাদশ শতকের সমাপ্তির পূর্বেই সারা ভারতবর্ষে ইংরাজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

পলাশীর যুদ্ধে বিজয়ী ইংরাজ সেনানায়ক ক্লাইভ বাংলার গভর্ণর হওয়ার পরে সাধারণ মানুষের ওপরে যে শোষণ শুরু হয় তা অভূতপূর্ব। চরম বিশৃঙ্খলা ও অত্যাচারে সাধারণ মানুষ বিশেষ করে কৃষিজীবি মানুষ চরম দুর্দশার মধ্যে পৌঁছোয়। ১৭৭০ সালের মন্বন্তরে সমস্ত দেশ ধ্বংস হ'য়ে যায়। মুসলমান নবাব ও সুবেদারদের সহায়তায় ইংরাজ বণিকদের শোষণ এই দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত দেশে কি মারাত্মকরূপ ধারণ করেছিল, তার কিছু পরিচয় আর একজন ইংরাজ রাজনীতিকের বক্তৃতা থেকেই পাওয়া যায়- "...We have murdered, deposed, plundered, usurped,-nay, what think you of famine in Bengal in which three millions perished".

[তিন]

ব্রিটিশ ভারতের প্রথম গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংস্ কলকাতাকে ভারতের রাজধানী করলেন। কাজেই উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে ভারতবর্ষে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা, সমাজ ও সংস্কৃতিবিষয়ক এবং বৃত্তি ও ব্যবসায়গত যা কিছু পরিবর্তন ঘটতে শুরু করল, তার কেন্দ্রবিন্দু হ'ল কলকাতা। বেঙ্গল রেণেসাঁ হ'ল ভারতবর্ষের পুনরুজ্জীবন এবং কলকাতাই তার মাধ্যম। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে ওয়ারেন হেষ্টিংস ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল হলেন। একই সঙ্গে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হ'ল সুপ্রীম কোর্ট। ১৭৮৪তে তিনি এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল এর প্রতিষ্ঠা করেন। রাজনৈতিক অস্থিরতা, যা এতকাল সকলকে বিপর্যস্ত করে রেখেছিল, তার অবসান ঘটায় সাধারণ মানুষ এমনকি রামমোহন, দ্বারকানাথ ও প্রসন্ন কুমার ঠাকুরও ব্রিটিশ শাসনকে অভিনন্দন জানান। এশিয়াটিক সোসাইটির মাধ্যমে জোন্স্, কোলব্রুক, প্রমুখ ভারতবিদ্যাবিদ্ পণ্ডিতেরা প্রাচীন ভারতের ধর্ম দর্শন ও সংস্কৃতির গৌরবকে সকলের সামনে তুলে ধরায় মানুষের চেতনায় এক গৌরবময় উজ্জ্বল ভারতের ছবি জেগে উঠল।

সাধারণভাবেও বিরাট পরিবর্তন এল মানুষের বৃত্তি, চাকুরি ও ব্যবসায়িক জীবনে। ইংরাজ ব্যবসায়ীদের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে তাদের

-কর্মচারী, রাজ কর্মচারী, আইনজীবী প্রভৃতির সঙ্গে পণ্ডিত ও অধ্যাপক শ্রেণী গড়ে উঠল।

১৮০০ খৃষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ এবং ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা কলকাতার নাগরিক জীবনে চিন্তার সম্প্রসারণের যে বিরাট দিগন্ত খুলে দিল তারই ফলস্বরূপ গড়ে উঠল বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় বা intelligentsia.

অন্যদিক থেকে প্রবল ধাক্কা এল খৃষ্টান মিশনারীদের হাতে। তারা নতুন শিক্ষা ও দর্শনের আলোকে হিন্দুধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থাকে সকলের চোখের সামনে নগ্ন করে তুলে ধরলো। আদিম বিশ্বাস ও সংস্কারের বীভৎসতা দেখে অনেকেই শিহরিত হ'ল, যার ফলে ধর্মত্যাগ করে খৃষ্টান হওয়া মানুষের সংখ্যাও দ্রুতগতিতে বাড়তে লাগল।

কলকাতা মহানগরী রূপে গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে পল্লীসমাজও ভেঙে পড়তে লাগল। Calcutta earlier than any other Asian city experienced "what Daniel Lerner has described as the transformation of a traditional society". *

সমাজের এই ক্ষয়িষ্ণু চেহারা দেখে রামমোহন শঙ্কিত হ'য়ে উঠেছিলেন। পৌত্তলিকতার সংস্কার ভেঙে একেশ্বরবাদকে প্রতিষ্ঠিত করতে তিনি দৃঢ়সংকল্প ছিলেন। কারণ ধর্মান্ধতার সংস্কার না ভাঙলে ধর্মান্তরের প্রবণতাকে রোধ করা যাবে না, এ'কথা রামমোহনই প্রথম অনুভব করেন। ১৮২৮-৩১ সালে ডিরোজিয়ো ও নব্যবঙ্গ দলের কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মহেশচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ ব্যক্তিদের হাত থেকে এল কালাপাহাড়ি আঘাত। সমাজের পক্ষে এই আঘাতেরও প্রয়োজন ছিল। এই আঘাতে আঘাতে সংস্কার ও দেশাচারের বাঁধনগুলি খুলে না পড়লে উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ থেকে সমাজ বিবর্তন ও সামাজিক রূপান্তরের যে প্রবাহ বইতে আমরা দেখেছি, তা হয়ত এত ত্বরান্বিত হতো না। হয়ত সেই পরিবেশ সৃষ্টি হ'ত না, যে পরিবেশে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো সংস্কারমুক্ত ও আধুনিক চেতনাসম্পন্ন দৃঢ় ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটেছে।

---

*Dadiv Kopf-British Orientalism and Bengal Renaissance, P 178.

পূর্বাভাষ

কলকাতা থেকে প্রায় বাহান্ন মাইল পশ্চিমে হুগলী জেলার (বর্তমানে মেদিনীপুর) এক অখ্যাত ও দরিদ্র গ্রাম বীরসিংহ। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে এদেশে রেললাইন চালু হয়নি। নদীর ওপরে সেতু বাঁধা হয়নি। যাওয়া আসার জন্যে হাঁটতে না পারলে গরুর গাড়ী। কিন্তু গাড়ী চলার মত রাস্তাও সর্বত্র ছিল না।

বীরসিংহ গ্রামের কোনই বৈশিষ্ট্য ছিল না। সংস্কৃত শিক্ষার টোল দূরে থাক, সাধারণ পাঠশালাও সে গ্রামে ছিল না। সে যুগে গ্রামের মানুষ কৃষি-নির্ভর ছিল। যারা সংস্কৃত শিখতো তারা টোল খুলতো, অথবা পুঁথি নকল করতো। যারা একটু-আধটু অঙ্ক এবং হাতের লেখা শিখতো, তারা জমিদার বাড়ীতে চাকরী করতো। এছাড়া গ্রামীন অর্থনীতিতে কুটিরশিল্পের একটা স্থান ছিল। তাঁতি, কামার, ছুতোর, কুমোর—হাতের কাজের মধ্যে দিয়ে জীবিকার অর্থ উপার্জন করতো।

অর্থনীতি ছিল পুরোপুরি জমিদারী নির্ভর। সামন্ততন্ত্র—রাজা মহারাজা, দেওয়ান, জমিদার, জায়গীরদার এবং তাঁদের কর্মচারীবৃন্দ—তখন দেশে প্রভুত্ব করতো।

১৮২০ খৃষ্টাব্দের ২৬শে সেপ্টেম্বর বাংলা ১২২৭ সনের ১২ই আশ্বিন বীরসিংহ গ্রামের এক অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে ঈশ্বরচন্দ্রের জন্ম।

যে পরিবারে তাঁর জন্ম, সেই পরিবারের দারিদ্র্য যে কি প্রচণ্ড ছিল, তার বর্ণনা একটু দেওয়া যেতে পারে। তাঁর পিতামহ রামজয় ছিলেন সন্ন্যাসী এবং গৃহত্যাগী। পিতামহী দুর্গাদেবী বনমালিপুরের গৃহ থেকে অর্থাৎ শ্বশুর বাড়ী থেকে বিতাড়িতা। পিতার প্রদত্ত একটি খড়ের ঘরে তিনি পুত্রকন্যা নিয়ে বাস করতেন। দুই পুত্র ও চারকন্যার সংসার তিনি কিভাবে চালাতেন, তার সঠিক বিবরণ পাওয়া শক্ত।

ঈশ্বরচন্দ্রের আত্মজীবনী থেকে জানা যায়—

"ঐ সময়ে টেকুয়া ও চরখায় সুতা কাটিয়া, সেই সুতা বেচিয়া, অনেক নিঃসহায় ও নিরুপায় স্ত্রীলোক আপনাদের দিন গুজরান করিতেন। দুর্গাদেবী সেই বৃত্তি অবলম্বন করিলেন।"

দারিদ্র্য অসহনীয় হওয়ায় চোদ্দ বছর বয়সেই দুর্গাদেবীর জ্যেষ্ঠপুত্র ঠাকুরদাস কিছু রোজগারের চেষ্টায় কলকাতায় যান।

আগেই উল্লেখ করেছি, যে, বীরসিংহ থেকে কলকাতার দূরত্ব বাহান্ন মাইল। এই পথ হেঁটে অতিক্রম করতে হতো। মধ্যে রূপনারায়ণ নদী পার হ'তে হ'ত নৌকায়। পথে ডাকাতের ভয় ত ছিলই। কিন্তু কলকাতা ছাড়া কাছাকাছি কোন উপার্জনের ক্ষেত্র থাকলে এত অল্পবয়সে তাঁর পুত্রকে কলকাতায় পাঠাতে নিশ্চয়ই রাজি হ'তেন না দুর্গাদেবী।

কলকাতায় পৌঁছানোর পর একটু ইংরাজি শিখবার জন্য কি সাধনাই না করতে হ'য়েছে ঠাকুরদাসকে। দিনের পর দিন উপবাসে শীর্ণ হ'য়েছে তাঁর দেহ। একমুঠো অন্নের জন্য পাচক ব্রাহ্মণের মত রান্না করতে হ'য়েছে অন্যের গৃহে। যেদিন এক ব্যবসায়ীর গদিতে মাসিক দু'টাকা মাইনের চাকরি পেয়েছেন, সেদিন মনে করেছেন যে, তাঁর পরিশ্রম সার্থক হ'য়েছে।

ঈশ্বরচন্দ্রের নবছর যখন বয়েস, তখন ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে পুত্রের শিক্ষার জন্য তাঁকে কলকাতায় নিয়ে গিয়েছেন ঠাকুরদাস। তিনি মাইনে পান তখন মাসে দশটাকা। ততদিনে তাঁর সংসারের আয়তনও অনেক বেড়েছে।

সংস্কৃত কলেজের ছাত্র ঈশ্বরচন্দ্রকেও সেই নিদারুণ দারিদ্র্যের কঠোরতা ভোগ করতে হ'য়েছে। বড়বাজারে দয়েহাটার জগদ্দুর্লভ সিংহের বাড়ীর নিচের তলার একটি অন্ধকার স্যাঁতসেতে ঘর। চারপাশে খোলা নর্দমা থাকার আরশোলাতে ঘর ভর্তি। "প্রতিদিন প্রাতে একপ্রহরের সময় (পিতৃদেব) কর্ম্মস্থানে যাইতেন, রাত্রি একপ্রহরের সময় বাসায় আসিতেন।"[১]

'যেদিন আসিয়া দেখিতেন যে, প্রদীপ জ্বলিতেছে আর তিনি (ঈশ্বরচন্দ্র) নিদ্রা যাইতেছেন, সেইদিন ক্রোধান্ধ হইয়া তাঁহাকে অত্যন্ত প্রহার করিতেন।'[২] কাজেই ঘুম পেলে বালক চোখে সরষের তেল দিতেন। সরষের তেলের আলোতেই তিনি পড়তেন; তেল ফুরিয়ে গেলে রাস্তায় গ্যাসের আলো ছিল সম্বল। রাতে ঈশ্বরকেই রান্না করতে হ'ত। তিনি ইস্কুলে যেতেন পিতামহীর হাতে কাটা ধুতি পরে।

---

১ বিদ্যাসাগর—আত্মচরিত।

২ শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন—বিদ্যাসাগর জীবনচরিত (১৯৬২) পৃঃ ২৪

অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন বালক ঈশ্বরচন্দ্রের শিক্ষার ব্যয়নির্বাহের জন্য ঠাকুরদাসকে বিব্রত হ'তে হয়নি। তিনি বৃত্তি ও পারিতোষিক লাভ করে নিজের পথে নিজেই এগিয়ে গেছেন। সংস্কৃত কলেজের শিক্ষা সম্পূর্ণ করতে তাঁর বারোবছরে তিনি অধ্যয়ন করেছেন সংস্কৃত ভাষা, সাহিত্য, ইংরাজী ভাষা, বেদান্ত, স্মৃতি, ন্যায় ও জ্যোতিষশাস্ত্র। এ'ছাড়া হিন্দু দর্শন ও পুরাণ এবং হিন্দু আইনেও তিনি গভীর জ্ঞান লাভ করেন।

১৮৪১ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর তারিখে কলেজের অভিজ্ঞাপত্র (Certificate) এবং বিদ্যাসাগর উপাধি লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ছাত্রজীবনের পরিসমাপ্তি।

কর্মজীবনের প্রথম উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে দেশ, জাতি ও সমাজের যে চিত্র তাঁর চোখে ধরা পড়েছে, তার উল্লেখ না করলে বিদ্যাসাগরের কর্মজীবনের পটভূমিকা বোঝা যাবে না।

একথা বলা হ'য়ে থাকে যে, ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ রামমোহন রায়ের কলকাতা আগমনের মুহূর্তেই বঙ্গদেশ ও হিন্দুসমাজের পুনরুজ্জীবনের কাজ শুরু হ'য়েছে।

রামমোহনকে সংগ্রাম করতে হয়েছে প্রথমত: উগ্র ও ধর্মান্ধ হিন্দু-সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে। পৌত্তলিকতা ও অনুষ্ঠানসর্বস্বতা থেকে ধর্মকে উদ্ধার করে' তিনি প্রাচীন বৈদিকধর্মের পুন: প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। দ্বিতীয়ত: তাঁকে লড়তে হয়েছে খৃষ্টান মিশনারীদের বিরুদ্ধে, তাদের হাত থেকে হিন্দুধর্মের মানুষকে এবং হিন্দুসমাজকে বাঁচাতে। পূজা ও দেশাচারের বদলে তিনি ব্রহ্মোপাসনার প্রবর্তন করেছেন।

১৮১৭ খৃষ্টাব্দে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা এদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এসেছে, এবং শিক্ষার্থীদের ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে আধুনিক পৃথিবীকে জানবার সুযোগ দিয়েছে।

হিন্দু কলেজে ঈশ্বরচন্দ্রের বন্ধুদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন নব্য বঙ্গের (Young Bengal) দলভুক্ত। তারা হিন্দুধর্মকে পরিত্যাগ করেই ক্ষান্ত হয়নি, হিন্দুধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতিকে ঘৃণা করেছে।

সতীদাহ আইনত: নিষিদ্ধ হ'য়েছে, কিন্তু নারী নিগ্রহ বন্ধ হয়নি। বন্ধ হয়নি শিশুহত্যা, নারীবিক্রয় এবং বাল্য বিধবার কঠোর কৃচ্ছতার সাধনা। জাতিভেদ, কৌলিন্যপ্রথা এবং দেশাচারে সমাজ জরাজীর্ণ হ'য়ে থেকেছে।

অন্যদিকে নতুন প্রাণের সাড়াও এসেছে। ওরিয়েন্টালিষ্ট উইলকিন্স-এর চেষ্টায় ছাপার প্রেস এসেছে; হ্যালহেডের বাংলাব্যাকরণ ছাপা হ'য়েছে, ইংরাজী ও বাংলা সংবাদপত্র বেরিয়েছে। তারপর পাঠ্যপুস্তক ছাপা হ'য়েছে। বেরিয়েছে বাংলা সংবাদপত্র। কেরীর চেষ্টায় বাংলাভাষায় বই লেখা হয়েছে। শিক্ষার জগতে ইংরাজি ভাষা এবং ইউরোপীয় ভাবধারার আবির্ভাব ঘটেছে।

কলকাতার শিক্ষিতসমাজকে সবচেয়ে বেশী ধাক্কা দিয়েছে ডিরোজিয়োর নব্যবঙ্গের দল। ডিরোজিয়োর দেহে পর্তুগীজ রক্ত, চিন্তা ও চেতনায় পশ্চিমী সংস্কৃতি। হিন্দুধর্ম বা সমাজের জন্য কোন মাথাব্যথা তাঁর ছিল না। হিন্দু-কলেজে যে ছাত্ররা তাঁর অনুরক্ত ছিল, তারা সবেমাত্র নগর সভ্যতার স্বাদ পেয়েছে; তাদের দেহে গ্রাম্য জমিদারতন্ত্রের রক্ত। হঠাৎ আলোর চমকে তাদের চোখ ও চিন্তা ধাঁধিয়ে গেছে। কাজেই হিন্দুধর্ম ও হিন্দুজাতিকে তারা ঘৃণা করতে চেয়েছে।

হিন্দুকলেজ ও সংস্কৃত কলেজ তখন একই ভবনের দুই অংশে অবস্থিত। হিন্দুকলেজের ছাত্রদের ভাবালুতা ও ইংরেজিয়ানা, বিদ্রোহ ও বিদ্বেষ যেমন বয়ে গেছে ঈশ্বরচন্দ্রের চারপাশ দিয়ে, গ্রামবাংলার সঙ্কীর্ণতা ধর্মান্ধতা ও দেশাচারের পীড়ণ এবং সমাজের আচার সর্বস্ব নির্দয়তা তেমনি প্লাবিত করেছে তাঁর চেতনা। তিনি দেখেছেন, সমাজের আত্মা কিভাবে বাঁধা পড়েছে নৈয়ায়িক ও পুরোহিত গোষ্ঠির হাতে। সুরেশচন্দ্র ঘোষ তাঁর Dalhousie in India গ্রন্থে লিখেছেন—

The burning of widows was stopped by Bentinck by regulation XVII but it took a longtime to finally suppress this evil and inhuman custom. Then nothing had been done to stop polygamy and child marriage. After the prohibition of *sati* the number of widows increased in large numbers. "............Girls were betrothed when a few months old and the infant daughters ultimately became a widow......................
"Parents murdered their infant daughters ...."

বীরসিংহ গ্রামেরই কালিকান্ত চট্টোপাধ্যায় ভঙ্গকুলীন; কাজেই একসঙ্গে সাতটির বেশী স্ত্রী পাননি। তিনি একটি মাত্র স্ত্রীকে কাছে রেখে

অন্যদের বিতাড়িত করেছেন। বিতাড়িতা প্রথমা স্ত্রীর গর্ভজাত কন্যার বিয়ে হয়েছিল যার সঙ্গে তার স্ত্রীর সংখ্যা চল্লিশ। কাজেই সেই বালিকাও আশ্রয়চ্যুতা। এই আশ্রয়হীনা রমণীদের বাঁচার উপায় কি ?

সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ ঈশ্বরচন্দ্রের কাছে অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় ছিলেন। বৃদ্ধ তর্কবাগীশ তাঁর ছাত্রের চোখের সামনে যেদিন বারোবছর বয়সের এক বালিকার পাণিগ্রহণ করলেন, তরুণ ঈশ্বরচন্দ্র সেদিন প্রকাশ্যে অশ্রু বর্ষণ করেছেন।

ঈশ্বরচন্দ্র দেখেছেন, শিশুবিধবাকে একাদশীর দিন জলবিন্দুও না দিয়ে বৃদ্ধ পিতা এক বালিকা স্ত্রীর সঙ্গে বিলাস মগ্ন। স্বামীবঞ্চিতা যুবতীরা হয় গণিকা হ'য়েছে আর নইলে আত্মহত্যা করেছে।

ঈশ্বরচন্দ্র দেখেছেন চড়কের পুজোর দিনে ধর্মান্ধ মানুষেরা লৌহশলাকায় জিভ ফুঁড়ে আত্মনিগ্রহ করেছে। Dr. Ramesh Ch. Majumdar "Glimpses of Bengal in the nineteenth century" গ্রন্থে লিখেছেন— "A deeprooted belief in a number of gods and godesses and worship of their images, the caste system, restrictions of food and marriage.........

The Sati or burning of the widows along with their dead husbands, throwing children into the Ganges, horrible tortures self inflicted during the charak puja and the pathetic tales of woes and sufferings of the kulin girls left the society unmoved."

সমাজের এই পরিবেশের মধ্যে কেটেছে তাঁর ছাত্রজীবন। ঈশ্বরচন্দ্র প্রস্তুত হয়েছেন আগামী দিনের সংগ্রামের জন্য।

আমরা স্মরণ করতে পারি যে, উনবিংশ শতাব্দীর সূচনাতেই ইউরোপে এক প্রচণ্ড ভাব বিপ্লব ঘটে গিয়েছে। ফরাসী বিপ্লবের প্রচণ্ড ধাক্কায় কেঁপে গিয়েছে পৃথিবী। যদিও বিপ্লবের ফলশ্রুতি সাম্রাজ্যই— জনশক্তির অযৌক্তিক বিস্ফোরণ, হিংসার প্রসার এবং সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি, তবু তার মধ্য দিয়েই ঘোষিত হয়েছে সমভ্রাতৃত্ব ও বিশ্বমানবতার আদর্শ। সূচনা হয়েছে মানবিক অধিকারবোধের।

নবজাগ্রত ইউরোপের ভাবচেতনায় স্পর্শ পড়েছে হিন্দু কলেজ ও ফোর্টউইলিয়াম কলেজে। ইউরোপীয় দর্শনচিন্তার প্রভাব পড়েছে বাঙালী-মানসে। বেন্থাম ও মিলের উপযোগবাদ এবং কোঁতের প্রত্যক্ষবাদ অভিভূত

করেছে তাদের। রুশোর গণতন্ত্রের প্রত্যয় এবং ডাইডিরটএর বিচারবাদ গ্রহণ করেছে তাদের তরুণ মন।

দর্শন ও সাহিত্য পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যজগতের চিন্তা ও চেতনাকে কাছাকাছি এনে দিয়েছে।

১৮৪১ সালের ২৯শে ডিসেম্বর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ফোর্টউইলিয়াম কলেজে বাংলাবিভাগের প্রধান পণ্ডিতের পদে যোগদান করলেন। কলেজের সেক্রেটারি তখন মেজর জর্জ টি মার্শাল।

সংস্কৃত কলেজ থেকে 'বিদ্যাসাগর' উপাধি লাভ করে ফোর্টউইলিয়াম কলেজে পণ্ডিতরূপে তিনি যোগদান করলেন বটে, কিন্তু তাঁর শিক্ষাজীবন তখনও সমাপ্ত হয়নি। মার্শাল এর পরামর্শ ও সহায়তায় তিনি ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যে অধ্যয়ন শুরু করলেন। তাঁকে একাজে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। পরে রাজনারায়ণ বসু ও নীলমাধব মুখোপাধ্যায় তাঁকে ইংরাজী সাহিত্য পড়ান। হিন্দু কলেজের রাজনারায়ণ গুপ্তকেও তিনি ইংরাজীর শিক্ষকরূপে নিযুক্ত করেছিলেন। আনন্দকৃষ্ণ বসুও তাঁকে ইংরাজী সাহিত্য—বিশেষত: সেক্সপীয়ার পড়তে সাহায্য করেছিলেন। এছাড়া ফোর্টউইলিয়াম কলেজে ছাত্ররূপে যারা আসতো সেই ব্রিটিশ সিভিলিয়ানদের সাহচর্য্য তাঁর পাশ্চাত্য-ভাবনার পথে অনেকখানি সহায়ক ছিল।

ফোর্টউইলিয়াম কলেজে তিনি পাঁচবছর ছিলেন, ১৮৪১ থেকে ১৮৪৬ সাল পর্য্যন্ত। এই পাঁচবছর তিনি শুধু বাংলাবিভাগের পণ্ডিতিই করেননি, কলেজ পরিচালনা, পরীক্ষার ব্যবস্থা সবদিক দিয়েই তিনি মার্শালকে সাহায্য করেছেন। সঞ্চয় করেছেন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। মার্শাল তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন—

I have derived most satisfactory aid from his learning and intelligence in matters connected with his office—and have also received much willing assistance in others of an extra nature, especially in the annual examination of candidates for scholarships in the Sanskrit College.

১৮৪৬ সালের ৬ই এপ্রিল তিনি সংস্কৃত কলেজে সহকারী সম্পাদকরূপে যোগদান করেন। এইপদে চাকরি করেন এক বছর তিন মাস।

শিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর আত্মবিকাশ এই সময় থেকেই শুরু হয়। সংস্কৃত কলেজের পঠনব্যবস্থার সর্বাঙ্গীন উন্নয়ণের জন্য তিনি একটি কর্মসূচী তৈরী করে অনুমোদনের জন্য সম্পাদক রসময় দত্ত'র হাতে দেন। কিন্তু সেদিন এক তরুণ শিক্ষকের প্রস্তাব প্রবীণ সম্পাদক রসময় দত্ত'র কাছে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়নি।

General Committee on Public Instruction-এর সম্পাদক হোরেস এইচ উইলসনের প্রস্তাব অনুসারে ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজের প্রতিষ্ঠা। ১৮২৩ এর ৬ই অক্টোবর গভর্ণর জেনারেল মার্কুইস হেষ্টিংসকে—একটি চিঠিতে উইলসন তাঁর শিক্ষা সংক্রান্ত নীতির ব্যাখ্যা দেন। সংস্কৃত কলেজ' এর মাধ্যমে উইলসন শিক্ষাব্যবস্থায় একটি নতুন দিগন্ত খুলে দিতে চেয়েছিলেন।

"Together with the traditional Sanskritic studies of rhetoric, sacred literature, law and grammar, Wilson initiated a science curriculum of mechanics, hydrostatics, optics, astronomy, chemistry, mathematics, anatomy and medicine." [David kopf—British Orientalism and Bengal Renaissance— P 183]

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে বেন্টিক সংস্কৃত কলেজ তুলে দেওয়ার কথা ভেবেছিলেন। কিন্তু কলিকাতার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রতিবাদে তা সম্ভব হয়নি। তবু শিক্ষা-দপ্তরের আর সেই আগ্রহ বা উৎসাহ ছিল না। সংস্কৃত কলেজের উন্নয়ন, পরিবর্তন বা সম্প্রসারণের কোন কথা তাঁরা আর ভাবেননি।

কলেজে সহ-সম্পাদকরূপে যোগ দিয়ে ছাব্বিশ বছর বয়সের তরুণ যুবক বিদ্যাসাগর কলেজ পরিচালনার নীতি, পঠন ব্যবস্থা, পাঠক্রম প্রভৃতির পরিবর্তন ও উন্নয়নের জন্য একটি সুপরিকল্পিত বিবরণী পেশ করেন। কিন্তু রসময় দত্ত তাঁর বিবরণীকে অগ্রাহ্য করেন।

অতীতে বিদ্যাসাগর যখন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে ছিলেন, তখন গভর্ণর জেনারেল হার্ডিঞ্জ একবার কলেজ পরিদর্শনে আসেন। মার্শাল তখন তরুণ পণ্ডিত বিদ্যাসাগরকে তাঁর সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দেন। সুযোগ পেয়ে বিদ্যাসাগর তাঁর সঙ্গে শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে কিছু আলোচনা করেন। বিদ্যাসাগর যা বলেন, তার সারাংশ হল—

সংস্কৃত কলেজের প্রতি সরকারী ঔদাসীন্য প্রায় অবহেলার পর্য্যায়ে পৌঁছেছে। আগে কলেজ থেকে উত্তীর্ণ ছাত্রদের জন্য পণ্ডিতের পদ দেওয়া

হ'ত। কিন্তু এখন ঐ পদ বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের ভবিষ্যত অনিশ্চিত।

বিদ্যাসাগরের দ্বিতীয় বক্তব্য ছিল মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা। ওই সকল বিদ্যালয়ে সংস্কৃত কলেজ থেকে উত্তীর্ণ ছাত্রদের নিয়োগের নীতিও তিনি গ্রহণযোগ্য হওয়া উচিত বলে জানান।

হার্ডিঞ্জ সেদিন এই তরুণ শিক্ষকের যুক্তিকে গুরুত্ব দিয়েই গ্রহণ করেছিলেন। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে ইউরোপীয় ধরণে ১০১টি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষক নির্বাচনের ভার দেওয়া হয় মার্শাল ও বিদ্যাসাগরকে। উপযুক্ত পরিবেশের অভাবে এই বিদ্যালয়গুলি বাঁচেনি।

বিদ্যাসাগর এ'সময়ে ইউরোপের শিক্ষাব্যবস্থার রূপ ও পদ্ধতি সম্পর্কে গভীর অনুসন্ধান শুরু করেছিলেন। তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহে শিক্ষাবিষয়ক যে সব গ্রন্থের নাম পাওয়া গেছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—

John Lock—The Principles of Education.

John Gasper and Spurxheim—Education, its elementry Principles.

J. William—The Education of People.

George Combe—Lectures of Popular Education.

A.E. Fletcher, Sir Charles Hay Cameron, Trevelyon প্রমুখের গ্রন্থ।

১৮৪৬ সালে সংস্কৃত কলেজে সহকারী সম্পাদকের পদে যোগ দিলেন তিনি; কিন্তু পঠন ব্যবস্থার পরিবর্তন ও উন্নয়নের প্রস্তাব অগ্রাহ্য হওয়ায় সংস্কৃত কলেজের চাকুরিতে ইস্তফা দিলেন।

ইতিপূর্বেই ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ছাত্রদের জন্য বাংলা বই রচনার কাজে হাত দিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর। হিন্দী 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' এবং মার্শম্যানের History of Bengal এর বাংলায় অনুবাদ ছেপেছিলেন লালবাজারে 'রোজারি ও আগু কোং'র প্রেস থেকে। এবার বন্ধু মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সঙ্গে যুক্তভাবে একটি প্রেস কিনলেন। জনৈক নীলমাধব মুখোপাধ্যায়ের কাছে ঋণ করতে হ'য়েছিল তাঁকে। তাঁর সম্পাদনায় এবং

তাঁর প্রেসে ছাপা 'অন্নদামঙ্গল' একশ কপি ছ'শ টাকা দামে কিনলেন মার্শাল ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ছাত্রদের জন্য। ফলে প্রেসের ঋণ শোধ হ'ল।

মার্শাল এরপরে সুযোগ পাওয়া মাত্র বিদ্যাসাগরকে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে ফিরিয়ে আনলেন। ১৮৪৯ খৃঃ-র ১ মার্চ তিনি ফোর্ট উইলিয়ামে এলেন হেড রাইটার ও ট্রেজারার হয়ে। কিন্তু মাত্র দেড়বছরের জন্য। ১৮৫০ খৃঃ-র ৫ ডিসেম্বর তিনি ফিরে গেলেন সংস্কৃত কলেজে শিক্ষা পরিষদের সম্পাদক ডঃ মোয়াটের আগ্রহে। কলেজে সর্ব্বাঙ্গীন উন্নয়ণের জন্য তাঁর বিস্তৃত অভিমত রিপোর্টের ভিত্তিতে পেশ করতে এরপর আর তাঁর দেরী হ'ল না। রসময় দত্ত পদত্যাগ করলে ১৮৫১ খৃঃ-র ২২ জানুয়ারি তারিখে তিন কলেজের অধ্যক্ষ হ'লেন। এবং সঙ্গে সঙ্গেই কলেজের শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারের পূর্ণ দায়িত্ব নিজের হাতেই তুলে নিলেন।

সমাজজীবনে বিবর্তনের যে স্রোত ইতিমধ্যে বইতে শুরু করেছিল, তার প্রবাহ ঈশ্বরচন্দ্রের ওপর দিয়েও বয়ে গিয়েছে। নব্যবঙ্গ দলের রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রামগোপাল ঘোষের সান্নিধ্যে তিনি যেমন এসেছেন, ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠাতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গেও তেমনি ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশেছেন। ১৮৪৭-৪৮ খৃষ্টাব্দে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীতে তিনি ছিলেন, অথচ ব্রাহ্ম সমাজভুক্ত হননি। তাঁর জীবনা অনুধাবন করে জানা যায়, কোনো ধর্মসভায় তিনি কখনো যাননি, কিন্তু পথ থেকে কলেরা রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিকে নিজের হাতে তুলে এনে শুশ্রূষা করেছেন। কোন সংস্কার মনে ছিল না বলেই সংস্কৃত কলেজের শিক্ষা জাতিনির্বিশেষে সকলের জন্য উন্মুক্ত করেছেন। 28.3.51 তারিখে শিক্ষাপরিষদের সেক্রেটারী ক্যাপ্টেন FFC Hoyesকে একটি চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন—"**I see no objection to the admission of other castes than Brahmanas and Vaidyas or in other words, different orders of Shudras, to the Sanskrit College.**

মানবিকতার বোধ তাঁর জীবনে এসেছে—প্রথম তাঁর জননী ভগবতী দেবীর কাছ থেকে। গ্রামের বধু ভগবতী দরিদ্র, অসহায়, রোগজীর্ণ সকল মানুষের কাছে ভগবতী। আশ্চর্য হতে হয় যখন তাঁকে বলতে শুনি—বাঁশ খড় দড়ি মাটিতে ঠাকুর গড়ে পূজো করে কি ধর্ম হয়? জননীর মন সংস্কার মুক্ত ও আধুনিক ছিল বলেই বিদ্যাসাগরের চেতনা এমন প্রবলভাবে আধুনিক হ'তে পেরেছিল।

সমাজে নারীর নির্য্যাতন যে তাঁকে ব্যাকুল করেছে, তার কারণ সুস্পষ্ট। তিনি দেখেছেন, গায়ের জোরে এবং সামাজিক প্রশ্রয়ে পুরুষ নারীকে ধর্ষণ করেছে, তার ওপরে বীভৎস অত্যাচার করে চলেছে। তার শিক্ষার অধিকারকে লুপ্ত করে, জীবনের সকল সাধারণ অধিকারকে অস্বীকার করে, কৃত্রিম পুণ্যের ঠাট তাদের ঘাড়ের ওপর চাপিয়ে রেখে শৃঙ্খলিত পশুর মতো নির্যাতন করেছে। শিশু বা বৃদ্ধা কেউই অব্যাহতি পায়নি' সে অত্যাচার থেকে।

অশিক্ষা, অজ্ঞতা, অন্ধতা ও সমবেত নির্যাতনের হাত থেকে—নারীকে মুক্তির আলোতে নিয়ে আসাই জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাজ বলে মনে করেছেন বিদ্যাসাগর। তাই ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে যখন 'হিন্দু ফিমেল স্কুল' স্থাপন করলেন জে ই ডি বেথুন, তখন একাজে তিনি তাঁর সহযোগী ও কর্মী হিসেবে বিদ্যাসাগরকে পেয়েছিলেন। বেথুনের ইচ্ছাতেই বিদ্যাসাগর ওই স্কুলের অবৈতনিক সম্পাদক হন, এবং 'স্কুল পরিচালনার পুর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ এবং দক্ষিণ বাংলার বিদ্যালয়সমূহের পরিদর্শক হিসাবে তাঁর প্রভাব যখন অপ্রতিহত, তখনই তিনি স্ত্রীশিক্ষার প্রসার এবং নারীর অধিকার রক্ষার কাজে তাঁর সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। ১৮৫৭-৫৮তে এক বছরের মধ্যে ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করে' এবং গভর্ণমেণ্ট সেই বিদ্যালয়গুলির ব্যয়ভার বহনে অসম্মত হ'লে সমস্ত দায়িত্ব নিজের হাতে নিয়ে তিনি এক অভুতপুর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। বালিকাদের জন্য শিক্ষা বিস্তারের ব্যাপক প্রয়াস ভারতবর্ষে এই প্রথম।

১৮৫১ থেকে ১৮৫৮ এই সময়ের মধ্যেই তাঁর জীবনের উজ্জ্বলতম মুহূর্তগুলির বিকাশ। ১৮৫০-এর ডিসেম্বরে তিনি দিলেন শিক্ষা ব্যবস্থা ও সংস্কৃত কলেজ পুনর্গঠন সংক্রান্ত তাঁর যুগান্তকারী রিপোর্ট। ১৮৫৫তে তিনি একই সঙ্গে বিধবা বিবাহ প্রচলন করার এবং বহুবিবাহ রোধের প্রয়াসে নিজেকে নিয়োজিত করলেন। ১৮৫৬র ১৬ই জুলাই তারিখে তাঁর চেষ্টায় বিধবাবিবাহ আইন বিধিবদ্ধ হ'ল।

সমাজ সংস্কারের কাজে বিদ্যাসাগর যে দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন, শিক্ষা সংস্কার ও বিস্তারে সম্ভবতঃ তার চেয়েও বেশী অগ্রসর হ'য়েছিলেন। সংস্কৃত কলেজ পুনর্গঠনের জন্য শিক্ষাপরিষদের সভাপতির কাছে তিনি যে প্রতিবেদন রাখেন, তা একদিকে যেমন বৈপ্লবিক, তেমনি তাঁর অসাধারণ আধুনিক মানসিকতার পরিচয়দায়ক। তাঁর বিস্তৃত রিপোর্টে

প্রাথমিক পাঠ বাংলাভাষায় হওয়ার ওপরে তিনি জোর দিয়েছেন। সংস্কৃত অলঙ্কারের শ্রেণী থেকে ইংরাজীকে অবশ্যপাঠ্য করতে বলেছেন। সামাজিক অনুশাসন সম্বলিত শাস্ত্রনির্দেশ (রঘুনন্দনের অষ্টবিংশতি তত্ত্ব) পুরো বাদ দেওয়ার প্রস্তাব রেখেছেন। এবং সাংখ্য ও বেদান্ত দর্শনের পরিপূরক হিসাবে আধুনিক ইউরোপীয় দর্শন পাঠনার ওপর জোর দিয়েছেন। এ'বিষয়ে তাঁর সুস্পষ্ট অভিমত হ'ল—His knowledge of European Philosophy shall be to him an invaluable guide to the understanding of the merits of the different systems.

তাঁর সুপারিশগুলির কিছু সংশোধনের চেষ্টা করে কাশীর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ ব্যালেন্টাইন যে অভিমত দেন, তার উত্তরে শিক্ষাপরিষদের সভাপতি ডঃ মোয়াটকে লেখা চিঠিতে বিদ্যাসাগরের মন্তব্য শুধু দুঃসাহসিক নয়, তাঁর সংস্কার মুক্ত আধুনিকমনের পরিচায়ক। বিদ্যাসাগর সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন—'বেদান্ত আর সাংখ্য যে অবাস্তব চিন্তাধারার ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে আছে, তা নিয়ে আজ আর বিতর্ক উঠবে না*। ....সংস্কৃত পাঠক্রমে এগুলি পড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে এই প্রভাব অতিক্রম করার জন্য ইংরাজী ভাষায় অন্যান্য দর্শনগুলিও পড়ানো উচিত।

ঐ চিঠিতেই তিনি তাঁর শিক্ষাদর্শ ব্যক্ত করেন।

ব্যালেন্টাইনের আপোষমূলক মিশ্রপদ্ধতির অভিমতকে উড়িয়ে দিয়ে তিনি বললেন—'দেশের পণ্ডিত সমাজকে ঘাঁটানোর কোন প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। তারা আমাদের সঙ্গে আপোষে আসুক—এ'ও আমরা চাই না; কারণ কোন ভাবেই তাদের সহায়তার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না।'

শিক্ষার উদ্দেশ্যকে ব্যক্ত করতে গিয়ে তিনি বলেছেন—'আমাদের যা করা দরকার, তা হ'ল শিক্ষার উপযোগিতাকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছিয়ে দেওয়া।'

এ'যে তাঁর মুখের কথা ছিল না, তার পরিচয় অজস্র। স্বগ্রাম বীরসিংহায় তিনি নিজেই প্রচুর টাকা ব্যয়ে অবৈতনিক বিদ্যালয় খুলেছিলেন।

---

* That the Vedanta and Sankhya are false systems of Philosophy, is no more a matter of dispute.

শ্রমজীবী ও কৃষিজীবী মানুষের পক্ষে জীবিকা ছেড়ে বিদ্যালয়ে আসা সম্ভব নয়, একথা তিনিই প্রথম উপলব্ধি করেন। ১৮৫৩ সালেই বীরসিংহায় ঐ সকল মানুষের জন্য তিনি নাইট স্কুল খোলেন। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন তাঁর গ্রন্থে* লিখেছেন—

"যাহারা অন্যের বাটিতে বেতন গ্রহণ করিয়া দিবসে গরু চড়াইত, বা যাহারা দিবসে কৃষি কর্ম করিত, তাহাদের লেখাপড়া শিক্ষার জন্য নাইট স্কুল স্থাপন করিলেন।"

চকদিঘির জমিদার সারদাপ্রসাদ সিংহকে দিয়ে সেই গ্রামে অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়েছিলেন নিজের দায়িত্বে। কার্মাটারে সাঁওতালদের জন্যও তিনি নিজেই নাইট স্কুল স্থাপন করেন।

শুধু প্রাথমিক বা মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে নয় উচ্চশিক্ষা প্রসারের জন্যও তাঁর প্রচেষ্টা কম নয়। মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউসনকে সকল প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে তিনি এক বৃহৎ বেসরকারী কলেজে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত এই কলেজের উন্নয়নের চেষ্টায় ব্যাপৃত থেকেছেন। মেট্রোপলিটান কলেজ ভারতবর্ষের প্রথম বেসরকারী কলেজ, যেখানে কোন ইংরাজ শিক্ষক কোনদিনই ছিল না।

বিধবাবিবাহ আইন পাশ করিয়েই তিনি ক্ষান্ত হননি কারণ আধুনিক মানুষের মতে তিনি ছিলেন goal oriented. সমাজে তাকে গ্রাহ্য করাতে না পারলে তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। সমাজ বিবর্তণের পথে এ'শুধু একটা ধাপ। বাল্যবিবাহ নিন্দনীয় একথা তিনি বারবার বলেছেন। আর আন্দোলন তুলেছেন বহুবিবাহ প্রথার অবসানের জন্য। এ'ব্যাপারে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও আত্মীয়রা, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতো বিরাট মানুষও বহুবিবাহ প্রথাকে সমর্থন করে বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টার তীব্র নিন্দা করেছেন। তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ বান্ধব তারানাথ তর্কবাচস্পতির সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ ঘটে গেছে। সেদিন তাঁর এই চেষ্টা সফল হয়নি; কারণ সিপাহীযুদ্ধের ঘটনায় ভীত ভারত সরকার আর হিন্দুর ধর্মবিশ্বাসে হাত দিতে সাহস করেনি।*

---

* . a despatch was received from the Secretary of State in which he objected to any measure of a legislative character being adopted at present as it did not appear that a large majority of the people were against the practice of polygamy. [C. E. Buckland Page 326.]

যুগের তুলনায় তাঁর চিন্তাধারা যে কত বেশী অগ্রসর ছিল, তার আর একটি উদাহরণ তুলে দিচ্ছি। জজ দ্বারকানাথ মিত্রর এজলাসে এক ভ্রষ্টা রমণীর উত্তরাধিকার সংক্রান্ত মামলায় বিদ্যাসাগরের মতামত চাওয়া হয়। প্রচলিত হিন্দুআইনে নারী ভ্রষ্টা হ'লে স্বামীর সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত হত। বিদ্যাসাগর প্রশ্ন করলেন যে, এইক্ষেত্রে ওই রমণী যখন ভ্রষ্টা হন, তখন তিনি স্বামীর সম্পত্তিতে অধিকার পেয়েছেন কিনা। উত্তর হয়, তার অনেক আগে থেকেই তিনি ওই সম্পত্তি ভোগ করছেন। বিদ্যাসাগরের মত হ'ল সম্পত্তির অধিকার একবার কোন বিধবা নারী যদি লাভ করে, পরবর্তী কালে সে ভ্রষ্টা হ'য়েছে, এই অজুহাতে সে অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করা যায় না। এই ঘটনায় হিন্দু সমাজে বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। বিদ্যাসাগরের জীবনী রচয়িতা সুবলচন্দ্র মিত্রও মন্তব্য করেন—Vidyasagar wanted in foresight and the whole Hindu Community was disappointed in him. * আরেক জায়গায় তাঁর উক্তি—"It is true that his opinions and convictions in many cases particularly in matters of social reform, were wrongly formed. *

অশিক্ষিত, দুঃস্থ গ্রাম্য মানুষের সেবায় তিনি নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। ১৮৬৯ সালে বর্ধমানে ম্যালেরিয়া জ্বর মহামারীর রূপ নিয়ে দেখা দেয়। বিদ্যাসাগর সেই সময় শরীর অসুস্থ থাকায় বিশ্রামের জন্য বর্ধমানে ছিলেন। তাঁর বাড়ীর কাছাকাছি এক মুসলমান পল্লীতে এই রোগ শোচনীয় অবস্থার সৃষ্টি করে। বিদ্যাসাগর সঙ্গে সঙ্গে প্রথমে তাঁর বাসাতে এবং পরে অন্য জায়গাতেও কয়েকটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করলেন। শুধু চিকিৎসালয় নয়, তিনি দরিদ্র মুসলমান ও অন্যান্য জাতির মানুষের মধ্যে নিজে সেবা ও শুশ্রূষার কাজ শুরু করলেন। তাদের খাদ্য পথ্য ও বস্ত্র সরবরাহের ভার গ্রহণ করলেন।

কার্মাটারেও সাঁওতাল পল্লীতে তিনি দরিদ্র আদিবাসী মানুষের রোগে ও দুঃখে উপস্থিত হ'য়েছিলেন। কার্মাটারে সাঁওতালদের কাছে লেখক জেনেছেন যে, মেথর পল্লীতে উপস্থিত থেকে তিনি নিজে হাতে কলেরা রোগীর শুশ্রূষা করেছেন। সাঁওতাল ও মেথর আদিবাসীদের কাছে তিনি শুধু তাদের নিজেদের লোক নন, দেবতার মত দয়াশীল মানুষ ছিলেন

* S. C. M. P. 607 and 534

১৮৬৯ সালে তিনি নিজের গ্রাম ও গৃহ চিরতরে ত্যাগ করে কলকাতায় চ'লে এলেন। কারণ আত্মীয়দের সঙ্গে আদর্শের বিরোধ। ১৮৭২ সালে নিজের একমাত্র পুত্রকে পরিত্যাগ করলেন। ফলে দাম্পত্য জীবনের শান্তিও নষ্ট হ'ল। এর আগে উত্তরপাড়ার কাছে একটি দুর্ঘটনায় তাঁর বুকে যে আঘাত লাগে, তাতেই তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছিল। ভগ্নস্বাস্থ্য উদ্ধার করতে বর্দ্ধমানে গিয়েছেন আর সেখানেও দুঃস্থ ও দরিদ্র মানুষের কাজে জড়িয়ে পড়েছেন। আত্মীয়দের মতো বন্ধুরাও তাঁর শত্রু হ'য়ে ওঠায় তিনি একটি নির্জন স্থানের সন্ধান করেছেন, যেখানে গিয়ে মাঝে মাঝে একটু বিশ্রাম নিতে পারেন। সাঁওতাল পরগণার কার্মাটারে তিনি ছোট একটি বাংলো বানিয়েছেন। কিন্তু কলকাতা ছাড়তে পারেন নি। ১৮৭৬ সালে বাদুড়বাগানে তাঁর নিজস্ব গৃহটি তৈরী করেছেন তাঁর গ্রন্থাগারটিকে বাঁচিয়ে রাখতে। সে গৃহেই ১৮৯১ সালে তাঁর দেহান্ত ঘটেছে। বঙ্গদেশের বক্ষ থেকে উন্মূলিত হ'য়েছে বনস্পতি।

যে যুগে দেশ ধর্মের প্রবল বন্যায় উত্তাল, সে যুগের পরিবেশে তাঁকে নাস্তিক বলে ভাবা খুবই স্বাভাবিক। গৌতম বুদ্ধের পর এদেশে তিনিই একমাত্র মানুষ যিনি ধর্মকে নয়, মানুষকেই বড় করে তুলতে চেয়েছিলেন। মানব সমাজকে তার সমগ্রতার মধ্য দিয়ে ভাবা আজও আমাদের কাছে দুঃসাধ্য সাধনা। তাই বিদ্যাসাগরকে আমরা বুঝতে পারিনি। প্রবল বাস্তবজ্ঞান ও ইতিহাস—চেতনার সঙ্গে তাঁর চিন্তায় যুক্ত হ'য়েছিল অবিমিশ্র মানবকল্যাণ। এ'পথে তিনি সেদিনও যেমন একক ছিলেন, আজও তেমনি।

আধুনিক মানসিকতা ও বিদ্যাসাগর

সমাজ ও সংস্কৃতির রূপান্তর ঘটে তখনই, যখন সামাজিক রীতি নীতি, আচার ও বিশ্বাস এবং অনুশাসন সম্পর্কে এবং ওই আচার ও অনুশাসন ইত্যাদির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে মানুষের প্রশ্ন জাগে। সাধারণত: সমাজের মানুষ উত্তরাধিকার সূত্রে প্রচলিত আচার ও বিশ্বাস অর্জন করে এবং সেগুলিকে অবশ্য পালনীয় বলে মানে। তবু ওই প্রশ্ন সৃষ্টি হয় দু'একজন মানুষের মনে, যে বা যারা কখনই সমাজের নিয়মে পুরোপুরি বাঁধা পড়ে না। তারা ধর্মান্ধতা ও দেশাচারের পাথরের দেওয়াল ভেঙে মানুষকে মুক্তির আলোতে নিয়ে আসতে ব্যস্ত হয়। এই মানুষগুলি প্রচলিত প্রথা ও অনুষ্ঠান পালনের মধ্যে অযৌক্তিকতার অভাবকে যেমন অনুভব করে, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রীতিনীতির মধ্যে মূল্যবোধের বিচ্যুতি দেখেও তেমনি শঙ্কিত হয়।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এমনই একটি বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, যিনি সমাজ বন্ধনীকে ভেঙে তাকে সচল ও প্রগামী করতে চেয়েছিলেন। সমাজ ও তার মানুষের প্রয়োজন সম্বন্ধে সচেতন থেকে শিক্ষার আলোকে তার দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটানো তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। সামাজিক মূল্যবোধের ধারণা তিনি অর্জন করেছিলেন ইউরোপের আধুনিকতম সমাজ বিপ্লবের শিক্ষা থেকে; এবং এই জন্যেই বলা যেতে পারে, তাঁর যুগের মানুষের মধ্যে বিদ্যাসাগরের মতো আধুনিক মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিত্ব আর আসেনি।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে হিন্দুধর্ম ও সমাজের সর্বাঙ্গীন অবক্ষয় সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠেছিল। একদিকে হাজার হাজার দেবদেবীর পুজার অনুষ্ঠান, জাতিভেদ, নির্দয় সামাজিক অনুশাসন, অন্যদিকে নারী সমাজের প্রতি অমানবিক আচরণ এই অবক্ষয়ের রূপকে প্রকট করে তুলেছিল। তবু এর মধ্য দিয়েই সমাজ বিপ্লবের দামামা বেজেছে। রামমোহন পৌত্তলিকতাকে অস্বীকার করেছেন, ডিরোজিও-পন্থীরা হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতিকেই আঘাত করেছে; আর বিদ্যাসাগর সমাজের অত্যাচার আর কুসংস্কারের সঙ্গে লড়াই করেছেন।

সমাজের সর্বক্ষেত্রে নবজাগরণের যে সুর বেজেছে তাকে ঐতিহাসিকেরা রেনেশাঁ বলে বর্ণনা করেছেন।

একথা মানতে দ্বিধা নেই যে ইউরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটেছিল বলেই ভারতীয় মানসে পরিবর্তনের আকাঙ্খা প্রচণ্ড হ'য়ে উঠেছিল। বৈজ্ঞানিক চিন্তা এবং পাশ্চাত্য দর্শনের যুক্তি ও বিচারবাদ ভারতীয় মানসকে প্রবলভাবে আলোড়িত করেছিল। এই আলোড়নের কেন্দ্রবিন্দুতে দাঁড়িয়ে বিদ্যাসাগর অধ্যয়ন করেছিলেন পৃথিবীর ইতিহাস। ফরাসী বিপ্লবের গতি যেমন তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি, আধুনিক ইউরোপের শিক্ষাদর্শও তিনি তেমনি গভীরভাবে অনুধাবন করেছেন। তাঁর যুক্তি ও বিচারপ্রবণতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে হৃদয়ের করুণা ও মনুষ্যত্ব। তাই সমগ্র ইউরোপীয় সংস্কৃতির চিন্তাধারা ও চলিষ্ণুতার সঙ্গে তিনি যুক্ত করতে চেয়েছিলেন প্রাচ্য সংস্কৃতির মহত্বকে। বিদ্যাসাগরের চরিত্রে এই অনন্য ব্যক্তিত্বের ধারাকে লক্ষ্য করেই রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—"যে গঙ্গা মরে গেছে তার মধ্যে স্রোত নেই, কিন্তু ডোবা আছে। বহমান গঙ্গা তার থেকে সরে এসেছে, সমুদ্রের সঙ্গে তার যোগ। এই গঙ্গাকেই বলি আধুনিক। বহমান কালগঙ্গার সঙ্গেই বিদ্যাসাগরের জীবনধারার মিলন ছিল; এইজন্য বিদ্যাসাগর ছিলেন আধুনিক।"

রবীন্দ্রনাথের এই উক্তির মধ্যে বিদ্যাসাগর চরিত্রের আধুনিক মানসিকতার রূপ সুস্পষ্ট হ'য়ে ফুটে উঠেছে। প্রাচীন সংস্কারের অন্ধতা ও ধর্মীয় অনুশাসনকে তিনি যুক্তির কষ্টিপাথরে ঘসে' বিচার করেছেন, দেশাচারের কঠিন দেওয়াল ভেঙে সমাজকে মানব চিন্তার পথে ধাবিত করেছেন।

সমাজ বিজ্ঞানী **Daniel Lerner** এর ভাষায়, **Physical, social and psychic mobility underlies the dynamics of modernization.** বিদ্যাসাগর এদেশের মানুষের মানসিক পরিবর্তন ঘটাতে চেয়েছিলেন প্রথমে শাস্ত্রবিচার ও যুক্তির দ্বারা, তারপরে শিক্ষাসংস্কারের পথে, বৈজ্ঞানিক ধারা এবং আধুনিক চিন্তার যোগাযোগের দ্বারা। তিনি প্রচলিত প্রথা ও ব্যবস্থাকে আমূল বদ্‌লে দিতে চেয়েছিলেন মানবিক চিন্তা ও নীতিবোধের প্রবর্তন করে'; এবং তার চেতনাকে পরিশীলিত করতে চেয়েছিলেন মানবিকতার অনুভবে, সাহিত্যসৃষ্টির পথে।

অথচ বিদ্যাসাগর জন্মগ্রহণ করেছিলেন কলকাতা থেকে অনেক দূরে হুগলী (বর্তমানে মেদিনীপুর) জেলার এক গণ্ডগ্রামে, এক রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ

পরিবারে। তাঁর পরিবেশ সমাজের অন্ধ আচারসর্বস্বতা ও ধর্মবিশ্বাসকে অবলম্বন করেই গড়ে উঠেছিল। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে যখন সতীদাহ নিষিদ্ধ করে আইন প্রণয়ণ করা হয়, তখন তাঁর বয়স নয় বছর। তাঁর চারদিকে প্রচণ্ড জাতিভেদের বৈষম্য, হাজারটা দেবদেবীর পুজার অনুষ্ঠান, লৌকিক আঁচারের অগণিত বেড়াজাল। ডঃ মজুমদারের ভাষায়'.........the suttee, or burning of the widows along with their dead husbands, throwing children into the Ganges, horrible tortures self-inflicted during the charakpuja and the pathetic tales of woes and sufferings of the Kulin girls left the Society unmoved.'

হিন্দুধর্ম ও সমাজব্যবস্থার এই বেদনাদায়ক পরিস্থিতিতে পাশ্চাত্যের মানুষেরা যেমন ঘৃণা প্রকাশ করেছে, বাঙালী হিন্দুরাও তেমনি। চার্লস গ্রাণ্ট্ বলেছেন, Indian religion is barbaric. আর নব্যবাংলার জনৈক ডিরোজিও-শিষ্যের উক্তি "আমি যদি মনে প্রাণে কোন বস্তুকে ঘৃণা করি তাহ'লে সেই বস্তু হ'ল হিন্দুধর্ম।" সেদিনের হিন্দুসমাজ ও সংস্কৃতিকে যারা প্রবল আঘাত দিয়েছে তাদের মধ্যে খৃষ্টান মিশনারি এবং নব্যবাংলা (বা Young Bengal) দলের নামের উল্লেখ করা যায়।

কিন্তু নব্যবাংলার কারও সৃষ্টিমূলক কোন ধারণা না থাকায় তারা সমাজের বুকে পরিবর্তন আন্‌তে পারেনি। সেদিক থেকে ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে প্রবর্তিত ব্রাহ্মধর্ম ও সমাজের দান অনেকখানি। ব্রাহ্মসমাজ যখন অত্যন্ত স্বল্প-পরিসরে সামান্য কিছু শিক্ষিত মানুষ নিয়ে দেশাচারের বিরুদ্ধে কিছু মতামত গড়বার চেষ্টা করছে তখনই এ'দেশে বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব। যদিও কর্মজীবনে তিনি প্রবেশ করেছেন ১৮৪১ সালে, তবুও ১৮৫১ থেকে ১৮৯১ এই চল্লিশবছর তাঁর প্রকৃত কর্মজীবন ; আর এই চল্লিশ বছরের মধ্যেই যে উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগৃতির শুরু তাতে কোন দ্বিমত নেই।

নবজাগরণ, পুনরুজ্জীবন, সংস্কারসাধন বা সমাজ পরিবর্তন ইত্যাদি যে কথাগুলি আমরা ব্যবহার করে থাকি, সেগুলি প্রায় সমার্থক। সেদিন ডিরোজিয়ানদের কেউ কেউ ভেবেছিলেন, যে, পাশ্চাত্যকরণের (wester-nization) মধ্যেই আমাদের মুক্তি। এঁরা কেউ কেউ খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা দিল অস্তিত্বের সঙ্কট। কি বলে তাঁরা তাঁদের পরিচয় দেবেন ? খৃষ্টান না হিন্দু ? কিম্বা অন্য কিছু। তাঁরা ভারতীয় না অন্য

কিছু? এই পরিবেশে ব্রাহ্ম ধর্ম একটা আশ্রয় গড়ে তুললো মুষ্টিমেয় কিছু লোকের জন্য।

একথা বলা অসঙ্গত হবে না, যে, বিদ্যাসাগরই প্রথম সেকুলার (Secular) দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সমাজ ও শিক্ষা ব্যবস্থার সর্বাত্মক পরিবর্তন ঘটাতে চাইলেন। প্রচলিত দেশাচারকে স্বীকার করলেন না, ধর্ম ও ঈশ্বর চর্চাকে তিনি ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে সরিয়ে রাখলেন, সমাজের অন্ধ ও অমানবিক অনুশাসনগুলিকে অগ্রাহ্য করলেন, এবং শিক্ষাকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে, তুলনামূলক পাঠের নীতিতে সংস্কৃত করলেন।

তিনি তাঁর উদ্দেশ্য ও আদর্শকে কোথাও ব্যাখ্যা করে বোঝাননি বলে' সমগ্র বিদ্যাসাগরকে বুঝতে আমাদের অসুবিধা ঘটে। কিন্তু তাঁর সমাজ সংস্কারের কাজগুলি যে বিক্ষিপ্ত ঘটনা নয়, বা নিছক করুণার প্রকাশ নয় তা তাঁর কর্মপন্থাকে প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত অনুধাবন করে গেলেই বোঝা যায়। তিনি এই পুরনো, ক্ষয়ে যাওয়া, পচা সমাজের মানুষকে নতুন করে যে গড়তে চেয়েছিলেন তা তাঁর এই উক্তিগুলি থেকে প্রতীয়মান। তিনি কথা-প্রসঙ্গে একবার বলেছিলেন—

"পুরাতন প্রকৃতি ও প্রবৃত্তিবিশিষ্ট মানুষের চাষ উঠাইয়া দিয়া সাতপুরু মাটি তুলিয়া ফেলিয়া নতুন মানুষের চাষ করিতে পারিলে, তবে এদেশের ভালো হয়।"

তিনি যে প্রাচীন ধর্মীয় সংস্কার বা দর্শনের সঙ্গে রক্ষা করে' মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে চাননি, তার কারণ, এমন আপোষের পথ ধরে মানুষের মনের অন্ধবিশ্বাসকে দূর করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব বলে মনে হ'য়েছে। বিশ্বাসের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন স্যামুয়েল বিয়ার, তা হ'ল— 'A set of concepts by which men interprete the world.' মনের এই স্থির ধারণাগুলির পরিবর্তন ঘটাতে না পারলে তার প্রাচীন পরিবেশ থেকে মানুষকে নতুন চেতনায় রূপান্তরিত করা যাবে না, এ কথা তিনি জানতেন। তাই "Compromise বা মাঝামাঝি পথ অবলম্বন করাকে তিনি নীতিবহির্ভূত বলে মনে করেছেন। এবং এ'ধরণের অনুরোধ আসায় শিক্ষাপরিষদের সভাপতি ডঃ মোয়াটকে লিখেছেন: 'It appears to me to be a hopeless task to conciliate the learned of India to the acceptance of the advancing Science of Europe.' অর্থাৎ ইউরোপের আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে ভারতীয়

পণ্ডিতদের প্রাচীন বিশ্বাসের মিলন ঘটানো আমার কাছে অসম্ভব ব্যাপার বলে মনে হয়।

মানুষকে তার বকার সংস্কার ও প্রাচীনতা থেকে মুক্ত করে সমাজকে সচল করতে চেয়েছিলেন তিনি। তার পরিচয়ও তাঁর শিক্ষা সংস্কার সম্পর্কিত রিপোর্টে পাওয়া যায়। ইংরাজীভাষাকে অবশ্যপাঠ্য করার ওপরে তিনি জোর দিয়েছিলেন, তার একটা কারণ, "their acquirements in English will enable them to study Modern Philosophy of Europe. Thus they shall have ample opportunity of compairing the systems of philosophy of their own with the new philosophy of the western world. প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দর্শনের তুলনামূলক আলোচনার ওপরে তিনি জোর দিয়েছিলেন, কারণ এইধরণের আলোচনার মাধ্যমেই তারা প্রাচ্যদর্শন রীতির ভ্রান্তিগুলি ধরতে পারবে। শিক্ষাপরিষদের সভাপতিকে লেখা একটি চিঠিতে তিনি আরও স্পষ্ট করে বলেছেন, যে, "বেদান্ত ও সাংখ্য যে ভুলপদ্ধতিতে গড়ে উঠেছে সে বিষয়ে এখন আর বিতর্কের অবকাশ নেই।"

সেইযুগে বেদান্ত সম্বন্ধে এমন উক্তি অসাধারণ নিশ্চয়ই। রামমোহন রায় বেদান্ত প্রচারেই তাঁর সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন।

আর একটি দুঃসাহসিক কাজ সংস্কৃত কলেজের পাঠক্রম থেকে রঘুনন্দনের অষ্টবিংশতি তত্ত্ব বাদ দেওয়া। রঘুনন্দন বা স্মার্ত রঘুনন্দন হিন্দু সমাজের বিধায়ক ছিলেন। সমাজ ও ধর্ম সম্বন্ধে অবশ্য পালনীয় কৃত্যগুলি নিয়েই অষ্টবিংশতি তত্ত্ব। বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, ঐ গুলি পুরোহিতদের জন্য বিধেয়, সাধারণ ছাত্রদের জন্য নয়।

বিদ্যাসাগরই ইতিহাসের প্রথম মানুষ যিনি শ্রমজীবী ও কৃষিজীবী এবং বয়স্কশিক্ষার জন্য বীরসিংহা ও কার্মাটারে নাইট স্কুল খুলেছিলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবনী পাঠ করে আমরা জানতে পারি যে সংস্কৃত কলেজে ছাত্র হ'য়ে থাকার সময়েই তিনি ইংরাজীভাষা অধ্যয়ন করেন। ১৮৪১ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে চাকরি পাওয়ার ফলে মার্শাল ও ব্রিটিশ সিভিলিয়ানদের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যে আসেন। সেই সময়ে তিনি ইংরাজী সাহিত্য পাঠ করেন আনন্দকৃষ্ণ বসু, ডাঃ দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তিদের কাছে। পরবর্তীকালে তিনি ইউরোপের ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্য ও শিক্ষাসংক্রান্ত গ্রন্থ কিনে নিজস্ব একটি পাঠাগার গড়ে তোলেন। ইউরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির

আলোকে স্নান করে বিদ্যাসাগর দেশীয় সমাজ ও শিক্ষাসংস্কারের কাজে নেমেছিলেন।

এও আমাদের জানা আছে, যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপে যে ভাব-বিপ্লব ঘটেছে, পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও তার প্রভাব পড়েছে। বেন্থাম, মিল ও কোঁতের দর্শন এবং রুশোর বিশ্বজনীন মানবতার আদর্শ, দীদেরো'র* বিচারবাদ, এবং ফরাসীবিপ্লবের প্রভাব বিদ্যাসাগরের ওপরেও পড়েছিল। তাই সমাজসংস্কারের আগে বিদ্যাসাগর শিক্ষাসংস্কারের কাজ হাতে নিলেন। তিনি ভেবেছিলেন, শিক্ষার আলোকেই মানুষের বুদ্ধি ও বিচারবোধকে উন্নত করে তোলা সম্ভব।

শিক্ষার দ্বারা চেতনার রূপান্তর ঘটানো সম্ভব—এ'কথা তিনি বিশ্বাস করতেন বলেই চেয়েছিলেন গণশিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষার পরিবেশ গড়ে তুলতে। তার জন্য তিনি যেমন প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করতে চেয়েছেন, তেমনি তার উপযোগী আদর্শ বিদ্যালয়ও গড়ে তুলেছেন। ছাত্রদের উপযোগী বই না থাকায় তিনি নিজেই বই লিখেছেন এবং নিজের প্রেসে ছেপে তা বার করেছেন। অসাধারণ সাহিত্য প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও তিনি বিপুল পরিশ্রম করে সেই সব বইই লিখেছেন যা শিক্ষার বনিয়াদকে গড়ে দেবে।

বিদ্যাসাগরের উদ্দেশ্য স্পষ্ট হ'য়ে ধরা পড়েছে ডঃ মোয়াটকে লেখা তাঁর চিঠিতে—'What we require to do is to extend the benefit of education to the mass of the people. Let us establish vernacular schools, let us prepare a series of vernacular class books on useful and instructive subjects, let us raise up a band of men qualified to undertake the responsible duty of teachers and the object is accomplished.'

আমাদের উদ্দেশ্য, শিক্ষার উপযোগিতাকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছিয়ে দেওয়া। আমরা যদি মাতৃভাষায় শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় চালাতে পারি, উপযোগী ও উপদেশমূলক বিষয়ে মাতৃভাষায় পাঠ্যপুস্তক রচনা করতে পারি, শিক্ষণের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণের মতো শিক্ষক গড়ে তুলি তাহ'লেই আমাদের কর্তব্য সম্পাদিত হ'য়েছে মনে করবো।

* Diderot.

আধুনিক মানুষ বা Modern Man-কে যে ভাষায় বর্ণনা করেছেন ড্যানিয়েল লার্নার, তা হ'ল :

He loves change, new things and experience. And he views the future as something to be created, not inherited from the past. He stands free of tradition and taboo and assumes a calculating attitude toward a manipulable and open future. He is therefore rational and goal-oriented. He measures success by purity of his faith. বাংলা করলে দাঁড়ায়—যিনি আধুনিক মানুষ তিনি পরিবর্তন ভালোবাসেন; কামনা করেন নতুন নতুন ঘটনা ও অভিজ্ঞতা। ভবিষ্যৎকে তিনি অতীতের প্রতিচ্ছবি রূপে দেখেন না, সৃষ্টির ক্ষেত্র বলে মনে করেন। প্রাচীন সংস্কার ও সামাজিক বাধা নিষেধ থেকে তিনি মুক্ত হ'য়ে দাঁড়ান; ভবিষ্যৎকে প্রয়োজনে রূপান্তরিত করা যায় জেনে, তিনি মেপে মেপে পা ফেলেন। বুদ্ধি ও বিচারবোধের ওপর তিনি নির্ভর করেন এবং অন্তিম লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন। আত্মবিশ্বাসের গভীরতা থেকে নয়, কাজের ফলাফল থেকেই তিনি সাফল্য নিরূপণ করেন।

বিদ্যাসাগরের জীবনের ঘটনাবলীর পরম্পরা ও তাৎপর্য লক্ষ্য করলে দেখা যায়, তিনি রক্ষণশীল চিন্তা বা অন্ধবিশ্বাস থেকে পুরোপুরি মুক্ত থেকে আপন আদর্শ ও লক্ষের দিকে দেশকে নিয়ে যেতে চেয়েছেন। কর্মক্ষেত্রে তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপ গুণে গুণে ফেলা। যেমন শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রথমে তিনি আমূল সংস্কার চেয়েছেন; শিক্ষাপদ্ধতির যেমন পরিবর্তন ঘটিয়েছেন, পাঠক্রমও তেমনি তাঁর লক্ষ্যের অনুকূল করে সাজিয়েছেন। পাঠ্যপুস্তক রচনা করেছেন, বর্ণ পরিচয় ও বোধোদয় থেকে শকুন্তলা ও সীতার বনবাস পর্যন্ত। নিজের প্রেসে সেই সব বই ছেপেছেন। বিদ্যালয় যেমন প্রতিষ্ঠা করেছেন, শিক্ষক শিক্ষণ কেন্দ্রও তেমনি। তাঁর এই পরিকল্পনার চিত্রায়ন এমনই সম্পূর্ণ ছিল যে, কোনখানে সামান্য কোন বাধা এলেই তিনি তার প্রতিরোধ করেছেন।

"Calculated steps...." বিদ্যাসাগর আগে শিক্ষা সংস্কারে হাত দিয়েছেন তারপর সমাজসংস্কারে। নারীর মুক্তির প্রয়াসেও তাঁর হিসেব করে সাজানো প্রত্যেকটি পদক্ষেপ। নারীর শিক্ষার ভিত তৈরী করেছেন যখন, তখনই নিন্দা করেছেন বাল্যবিবাহের। 'বিধবা বিবাহ' আইন হিসাবে গ্রাহ্য করানোর আগেই বলেছেন, বহুবিবাহের অযৌক্তিকতা ও বেদনাময় গ্লানির

কথা। আগে শাস্ত্র থেকে যুক্তি তুলে দেখিয়েছেন, তারপর আইন। এবং তারও পরে নিজের একমাত্র পুত্রের বিবাহ বিধবার সঙ্গে দিয়েছেন।

বিদ্যাসাগরের আধুনিক মানসিকতার আর একটি পরিচয়, তিনি ধর্মকে আশ্রয় করে সাধারণের সামনে এসে দাঁড়াননি। দাঁড়িয়েছেন মানবিকতার ছায়ায়। তাই তাঁর অস্ত্র ছিল শিক্ষা ও যুক্তিবাদ। ঈশ্বরের অবতারণা না করে সংবাদপত্রে জনমত গড়তে চেয়েছেন।

ড্যানিয়েল লার্নার বিদ্যাসাগরকে চোখে দেখেননি; ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার উজ্জীবনের স্বরূপও তিনি জানেন না। কিন্তু তিনি যদি বিদ্যাসাগরকে প্রত্যক্ষ করতেন, তাহলে তাঁর আদর্শ 'মডার্ণ ম্যান'-এর সংজ্ঞায় পুরোপুরি মেলানো যায়, এমন মানুষকে চোখের সামনে পেয়ে নিশ্চয়ই পুলকিত হ'তেন।

সংস্কারমুক্তি ও
আধুনিক মানসিকতা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বিদ্যাসাগর বক্তা' (১৯৭৭) হিসাবে প্রদত্ত (১৯৭৯ এপ্রিল-মে) পাঁচটি বক্তৃতার অনুলিপি।

ধর্ম

ছান্দোগ্য উপনিষদের একটি কাহিনী নিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ব্রাহ্মণ' কবিতাটি রচন করেছিলেন। ঋষি গৌতমের কাছে শিষ্যরা এসেছে ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষার জন্য। গৌতম প্রস্তুত হ'য়ে বসেছেন, এমন সময় এক অজ্ঞাতকুলশীল তরুণ বালক এসে জানালো, যে, সেও ব্রহ্মবিদ্যা লাভে অভিলাষী।

প্রচলিত রীতি অনুযায়ী শুধু ব্রাহ্মণ সন্তানই তখন ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষার অধিকারী ছিল। সেই বালক যখন শিক্ষার জন্য আগ্রহী, তখন নিশ্চয়ই সে ব্রাহ্মণ সন্তান। তবুও গৌতম তার গোত্র জানতে চাইলেন।

বালক সেদিন ফিরে গেল। কারণ কোন গোত্রে তার জন্ম, তা তার জানা ছিল না। পরের দিন জননীকে জিজ্ঞাসা করে সে ঋষির চরণের কাছে এসে দাঁড়ালো। তার কথায় জানা গেল, সে গোত্রহীন; তার পিতৃ পরিচয় নেই।

অন্ত্যজ এক গণিকা পুত্রের এই স্পর্ধায় সেদিন সমবেত ছাত্রদের মধ্যে যখন প্রচণ্ড গুঞ্জন ও ধিক্কার ধ্বনি উঠল, তখন গৌতম তাঁর আসন ছেড়ে উঠে সেই বালককে আলিঙ্গন করে, বললেন—

"তুমি দ্বিজোত্তম, তুমি সত্যকুলজাত।" *

সাধারণ মানুষের ধারণায় যে বালক ব্রাত্য এবং অপাংক্তেয়, ঋষির সত্য দৃষ্টিতে সে দ্বিজোত্তম। নিয়মের মধ্যে যে সত্য, সে শুধু নিয়মের গণ্ডিতেই বাঁধা। ঋষির উদার দৃষ্টিতে সঙ্কীর্ণতার গণ্ডি নেই। তাই তিনি মনুষ্যত্বের সত্যকে দেখতে পেয়েছিলেন। তাঁর চিন্তা চলিষ্ণু বলেই বৃহত্তর জগতের দিকে তিনি নিজেকে প্রসারিত করতে পেরেছিলেন।

স্রোতস্বতী নদীর সঙ্গেই মানুষের জীবনের তুলনা করা যায়। পাহাড়ের গুহার অন্ধকার ঠেলে—নদী ঝাঁপিয়ে পড়ে—পৃথিবীতে; প্রবাহিত হয় দূর সমুদ্রের অভিমুখে—। নিরন্তর প্রবহমানতাই নদীর ধর্ম। নদীর মতই মানুষের জীবন—তার ধর্মও এগিয়ে চলা। এগিয়ে যাওয়া পূর্ণতার পথে।

* রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—'ব্রাহ্মণ' কবিতা দ্রষ্টব্য।

কিন্তু নদীর দুধারে থাকে কঠিন তীরভূমি। জীবনের চারধারেও থাকে নিয়মের বেড়া। সাধারণ মানুষ এই বেড়ার আড়ালেই নিজেকে গুটিয়ে রাখে। কিন্তু এমন দু একটি মানুষ থাকে যে নিয়মের বাঁধনে আচ্ছন্ন হয় না। সে এগিয়ে চলতে চায় জীবনের পূর্ণতার দিকে।

মানুষের জীবনে এই দুটো সত্তার সংঘর্ষ। একটা তার ব্যবহারিক সত্তা। এখানে সে আপন অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সদাই ব্যস্ত। জীবন ধারণের জন্য তাকে যেমন স্বচেষ্ট হ'তে হয়, জীবন রক্ষার জন্যেও তেমনি গড়তে হয় সমাজ ও সামাজিক নীতি। অথচ এই সমাজ ও তার নিয়মই একদিন রুদ্ধ করে তার অগ্রগতি। তখন চলার চেয়ে নিয়ম বড় হ'য়ে ওঠে।

তবু আর একটি সত্তা—তার প্রাণময় সত্তা আকুল হ'তে থাকে এগিয়ে চলার জন্যে। নিয়ম ও আচারের বেড়া ভেঙে মুক্তির স্বাদ পেতে সে সাধনা করে। কারণ মুক্তির মধ্যে সে জীবনের পূর্ণতা পায়।

এই সত্যটিকেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর অপরূপ ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। কবির ভাষাতেই বলি—

"সমাজে সর্বসাধারণের প্রচলিত ব্যবহাররীতিকে আচার বলে। কোনো কোনো দেশে এই আচার ব্যক্তিগত অভিরুচির স্বাতন্ত্র্য ও বৈচিত্র্যকে সম্পূর্ণ চাপা দিয়ে রাখে। সেখানে মানুষ হ'য়ে ওঠে পুতুল।"

সেই আচার ও প্রচলিত রীতির হাত থেকে উদ্ধার না পেলে মানুষের উপায় নেই। তার মনুষ্যত্বই তাকে উদ্বুদ্ধ করে বাঁধন ছিঁড়ে জীবনের প্রবহমানতাকে খুঁজে নিতে। তখন

যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালিরাশি
বিচারের স্রোতঃ পথ ফেলে নাই গ্রাসি,
পৌরুষেরে করেনি শতধা......

সেই স্বর্গে—তার অন্তরকে জাগ্রত করতে চায়।

অর্থাৎ একদিকে পায়ে পায়ে তাকে জড়িয়ে ধরেছে তার সহজাত বিশ্বাস এবং সংস্কার; অন্যদিকে তাকে আহ্বান করছে মুক্তির নতুন দিগন্ত।

প্রচলিত রীতিনীতি ও আচার এবং সামাজিক প্রথা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের প্রতি মানুষের যুক্তিহীন বিশ্বাস ও নির্ভরতাকেই বলা যায় সংস্কার। সংস্কার মানুষকে বাঁধা রাস্তায় জন্তুর মত মাথা নীচু করে চলতে বাধ্য করে। চলতে

চলতে চলার বেগে কখন ভেঙে গিয়ে সে পথ খাদ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, সে বোধ তার থাকে না।

সংস্কার মানুষের চেয়ে দেখবার, বা প্রয়োজনে নতুন পথ খুঁজবার চেষ্টাকে আটকে রাখে। সংস্কার থেকে আসে প্রথা ও অনুষ্ঠান পালনের অন্ধ অভ্যাস, যে নিয়মের একদিন প্রয়োজন ছিল, প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে সেই নিয়মই বাঁধন হ'য়ে দাঁড়ায়। অর্থহীন, এমনকি নির্দয় হ'লেও প্রথাপালনই তখন তার ধর্ম, জীবনের চারদিকে পাথরের দেওয়াল দিলে বাইরের আলো আর ভেতরে আসে না। মানুষের আত্মা সেই পাথরে শুধু মাথা কুটে মরে। সেই দেওয়ালের বাইরে বৃহত্তর যে জীবন এবং চলমান যে জগৎ বর্তমান, তার সঙ্গে যুক্ত হবার জন্যে মানুষের প্রাণকে তখন সাধনায় বসতে হয়।

মানুষকে নিয়ে এই জগৎ প্রতিদিনই আবর্তিত হ'চ্ছে। জীবন প্রতিমুহূর্তেই উন্মোচিত করছে নিজেকে। প্রাত্যহিক জীবন যাপনের মধ্যে মানুষ সীমাবদ্ধ নয়। জীবনের সত্যকে খুঁজে বার করতে সে সর্বদাই অস্থির। বৃহত্তর মানব সমাজের বিবর্তনের আলোকে—জীবনের সত্যকে মিলিয়ে নেওয়ার প্রয়াসই হ'ল আধুনিক মানসিকতা। অন্ধ আচারের হাতে জীবনকে খর্ব হ'তে না দিয়ে নতুন চেতনার আলোকে তাকে উজ্জীবিত করার জন্যই এই প্রয়াস।

ভোরের আকাশে যখন সূর্যের উদয় হয়, তখন তার আলোকছটা আকাশের সবগুলি দিগন্তেই পৌঁছে যায়। মানুষের জীবন ও চেতনাতে তেমনি যখন নতুন আলোকের কিরণসম্পাত ঘটে, তখন তার বুদ্ধি ও ভাবনার প্রকাশের সবগুলি ক্ষেত্রেই সে-আলোকে দীপ্ত হ'য়ে ওঠে। বদ্‌লে যায় তার সমাজ ভাবনা, শিক্ষা চিন্তা ও শিল্পানুভব। নতুন হ'য়ে ওঠে তার স্বদেশ চেতনা এবং জীবন বোধ।

বাঙালী মানস ও বাঙালী সমাজে—চেতনার এই নব উজ্জীবন বারবারই ঘটেছে। এই দুর্বার প্রাণশক্তি তাকে এগিয়ে নিয়ে গেছে সংস্কারের ঘন অন্ধকার থেকে জীবন বোধের দীপ্ত আলোকে।

[দুই]

সংস্কার ও সংস্কার মুক্তির সাধনা চিরকালই এক সমান্তরাল গতিতে বয়ে চলেছে। ইতিহাস বলে, যে, প্রাচীন বৈদিকযুগেও মানুষ নানা দেব-

দেবীতে বিশ্বাস করেছে এবং দেবতাকে প্রসন্ন করতে যাগযজ্ঞ এবং যজ্ঞের অনুষ্ঠানে ঘোড়া মোষ এমন কি মানুষ পর্য্যন্ত বলি দিয়েছে। পুরোহিতকুলের অন্ধতা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের রীতি সেদিনও কিন্তু মানুষের সত্য দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে রাখতে পারেনি। পারেনি বলেই উপনিষদ বা জ্ঞানের যুগ দেখা দিয়েছিল। পশুবলির অনুষ্ঠানকে উপনিষদে নির্বোধ একটি প্রথা বলে বর্ণনা করা হ'য়েছে। বহুদেবতার চিন্তাকে অপনীত করে উপনিষদ স্বীকার করেছে এক এবং অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে। এই ব্রহ্ম চেতনা শেষ পর্যন্ত উপনিষদের মানুষকে এই পার্থিব জগতের উর্ধে এক অকল্পনীয় অচিন্ত্য অরূপ ও নির্গুণ ঈশ্বরে হৃদয়মন সমর্পণ করতে শিখিয়েছে।

এমনই এক সময়ে জন্ম নিয়েছেন গৌতম বুদ্ধ। একদিকে বৈদিক দেবদেবীর প্রতি নির্ভরতা এবং প্রথা ও অনুষ্ঠানের প্রতি একান্ত আনুরক্তি, অন্যদিকে—অজ্ঞেয় ও অচিন্ত্য ব্রহ্মের কল্পনা—এই দুই প্রান্ত থেকে মানুষকে মানুষের ধর্মে ফিরিয়ে আনতেই জাগ্রত হ'য়েছিলেন বুদ্ধ। বেদান্ত যখন এই জীবনকে শাশ্বত ও অপরিবর্তনীয় এবং অগুণ এক সত্বার সঙ্গে যুক্ত করতে চেয়েছে, বৌদ্ধ দর্শন তখন জীবন ও জগৎকে নিত্য পরিবর্তমান, গতি প্রবাহ বলে বর্ণনা করেছে। উপনিষদের সাধনা, ঈশ্বরের চির আনন্দময় রূপের অনুভব ; আর বুদ্ধের কামনা মানবসমাজের অন্তহীন বেদনার উপলব্ধি। মধ্য যুগেও দেখা গিয়েছে, এই দেশে ব্রাহ্মণ্য সংস্কার যখন প্রবল হ'য়ে উঠেছে, তখনও সাধারণ ও অন্ত্যজ মানুষ—সহজ উপলব্ধির পথেই ঈশ্বরকে খুঁজেছে। সেদিনের চর্যাপদগুলির কথাই যদি মনে করি—

> পণ্ডিত স অল সত্য বকৃখানই
> দেহহি বুদ্ধ বসন্ত ণ জান ই ॥

অর্থাৎ, পণ্ডিতেরা বাইরে থেকে সত্যের ব্যাখ্যা করেন। দেহের মধ্যেই যে জ্ঞান বিরাজিত, সে খবর তাঁরা রাখেন না।

এই সহজ লোকধর্ম সাধারণ মানুষের মধ্যেই থেকে গেছে। রাজা জমিদার ও বর্ণ হিন্দুদের পরাক্রমে ব্রাহ্মণ্য সংস্কারই সমাজের ওপর তলায় স্থান পেয়েছে। মাথা তুলেছে সেই আদিম পুরোহিততন্ত্রই।

বাঙালী মানসে ধর্মান্ধতা ও পৌরাণিক প্রথা পালনের প্রবণতা প্রচণ্ড হ'য়ে উঠেছিল মধ্য যুগে এসে। দ্বাদশ শতাব্দীতেই এদেশের মাটিতে তুর্কী,

পাঠান ও মোগল দস্যুদের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। তারা এদেশের ধনসম্পদই শুধু লুঠ করেনি, ধ্বংস করেছে দেবমন্দির, আর ধর্ষণ করেছে হিন্দু নারীকে। সম্পদ ও ধর্মনাশের ভয়ে বিহ্বল হিন্দু সমাজ শামুকের মতো নিজেকে গুটিয়ে এনেছে একটা গণ্ডীর মধ্যে।

এই সময়েই নিজেকে মেলে ধরল ইসলাম ধর্ম। ঐস্লামিক ধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থার সাম্যনীতি আকৃষ্ট করল অত্যাচারিত ও বিভ্রান্ত শূদ্র ও পতিত মানুষকে। তারা দলে দলে মুসলমান হয়ে গেল।

একই সময়ে দেখা দিল তান্ত্রিক ধর্মের প্রবলতা। একদিকে পুরোহিত তন্ত্রের নিষ্পেষণ ও ধর্মের বীভৎস প্রথা ও অনুশাসন, আর একদিকে বহিরাগত মুসলমান রাজতন্ত্রের অত্যাচার—এর মধ্যে থেকে মুক্তির পথ খুঁজছিল আর্ত হিন্দুমানবতা। মুক্তি দাতারূপে তখন আবির্ভূত হ'লেন চৈতন্য দেব।

সংস্কার ও অনুষ্ঠান সর্বস্বতার বেড়া ভেঙে আচারের দুর্গম শৈলশিখর থেকে উদ্ধার করে ধর্মকে তিনি প্রবাহিত করলেন ভক্তি ও প্রেমের অনুভবের মধ্যে। ধর্মের গোঁড়ামিকে ধুইয়ে দিলেন প্রেমের জলস্রোতে। জাতিভেদ বা অস্পৃশ্যতা না মেনে আচণ্ডাল সকল মানুষকেই তিনি বুকে টেনে নিলেন। অবহেলিত ও অত্যাচারিত মানুষের বুকের বেদনাকে ভালোবাসায় মুছে দিলেন। বললেন, পূজোর জন্য কোন অনুষ্ঠানের দরকার নেই, পুরুতেরও না। ভগবান সকল মানুষের। তাঁকে পাওয়া যায় তাঁর নাম কীর্তন করলেই। শুধু নামেই মুক্তি।

চৈতন্যর মতো এতবড় মানবতাবাদী ধর্ম বিপ্লবী বাংলার ইতিহাসে আর কেউ আসেনি। হাজার বছরের অন্ধ সংস্কার ও ধর্মের গোঁড়ামিকে তিনি যেমন পলকে ভেঙে দিয়েছিলেন, ভালোবাসার স্রোতে ধর্মকে তেমনি মানুষের বুকের মধ্যে এনে দিয়েছিলেন।

মানুষের চেতনা থেকে আচারের খোলস যে তিনি কিভাবে সরিয়ে দিয়েছিলেন, তার প্রমাণ চৈতন্যোত্তর বাংলা সাহিত্য। বৈষ্ণব কবিদের কল্পনা থেকে দেবদেবীরা সরে গেল ; এল মানুষের অনুভব ; রাধাবাদের আড়ালে নর-নারীর প্রেম ও বিরহ বেদনা। সার্থক গীতি কবিতার সূচনাও এই প্রথম। বৈষ্ণব কবিদের রচনা—

সই, বলিতে বিদরে হিয়া
আমার বঁধুয়া আন্ বাড়ী যায়
আমারি আঙিনা দিয়া॥

চৈতন্যের আবির্ভাবে সংস্কারের জড়তা এমনি ভাবেই কেটে গিয়েছিল ; গোঁড়ামি ধুয়ে গিয়েছিল অপরিমেয় জীবনাবেগে।

কিন্তু সংস্কারের পলি আস্তে আস্তে আবার জমতে শুরু করেছে। 'আবার রুদ্ধ করেছে জীবনের স্রোতকে। বদ্ধ জলায় জমেছে পানা আর শ্যাওলা।

সে হ'ল অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতবর্ষ।

[তিন]

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইউরোপের আকাশে মানব চেতনার নতুন আলোকপাত ঘটেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনাতেই মানবিকতার উদ্বেল প্লাবন—ইউরোপ ও আমেরিকার মানুষ নতুন করে জেগে উঠল। ভারতবর্ষ এবং বঙ্গদেশের সমাজে তখনো পৌরাণিক সংস্কারের নিবিড় তামসিকতা।

হিন্দু সমাজে উপাস্য দেবদেবীর সংখ্যা অগণিত। বৌদ্ধধর্ম এবং ঔপনিষদিক ধর্ম—দুইই মানুষের মন থেকে নিশ্চিহ্ন। বৈষ্ণবধর্মও আটকা পড়েছে সমাজের নিচু তলার মানুষের মধ্যে। সমাজে প্রতাপ শুধু বর্ণ হিন্দুর এবং ধর্মরক্ষক পুরোহিত সম্প্রদায়ের। হিন্দুর দেবদেবী— শিব, দুর্গা, কালী থেকে শনি, মনসা, দক্ষিণ রায়, ওলাবিবি এমনকি বট অশ্বত্থ গাছ পর্য্যন্ত। দেবতা যেমনই হোক পুজোর অনুষ্ঠানই হ'ল আসল। মঙ্গল কাব্য, পাঁচালী ও লৌকিক স্তবস্তুতির মধ্যে দিয়েই যুগের মানসিকতা ব্যক্ত হ'য়েছে। সে মানসিকতা পুরোপুরি দেবমুখী, ব্যক্তিমানবের চিন্তা থেকে বিচ্যুত।

এই পরিবেশের সুযোগ নিতেই এগিয়ে এসেছিল খৃষ্টান মিশনারিরা।

রামমোহন রায়ই আধুনিক ভারতের প্রথম পুরুষ যিনি দেশাচার ও পৌরাণিক সংস্কারকে মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিতে পেরেছিলেন। রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করলেও রামমোহনের সুযোগ হয়েছিল ব্রাহ্মণ্য সংস্কার থেকে মুক্ত থাকার। তিনি সংস্কৃত ও ফারসি ভাষার মতো ইংরাজী ভাষাও যত্নের সঙ্গে অধ্যয়ন করেছিলেন। বেদ ও উপনিষদ যেমন পাঠ করেছিলেন, তেমনি পড়েছিলেন কোরান ও বাইবেল। রামমোহনই প্রথম তুলনামূলক

বিচার করলেন হিন্দু, ইসলাম ও খৃষ্টান ধর্মের। তাঁর সিদ্ধান্ত ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়। খৃষ্টধর্মের মধ্যে যারা trinitarian বা ত্রিত্ববাদী তাদের ভ্রান্তি তিনি যেমন দেখিয়ে দিলেন, তেমনি হিন্দুসমাজের মানুষের কাছেও ঘোষণা করলেন, যে বহু দেবদেবীর পূজা নিছক অজ্ঞতাপ্রসূত এবং লৌকিক সংস্কার থেকে জাত। পৌত্তলিকতার সংস্কার দূর করতে তিনি বেদান্তসার বাংলায় অনুবাদ করলেন। এই গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি যা বলেছেন, তার থেকেই তাঁর চিন্তার আধুনিক মনস্কতার পরিচয় পাওয়াযায়—

"My constant reflections on the inconvenient or rather injurious rites introduced by the peculiar practice of Hindu idolatory ...have compelled me to use every possible effort to awaken them from the dream of error.

হাজার রকমের ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও ক্রিয়ার প্রতি প্রবল বিতৃষ্ণা ছিল বলেই রামমোহন প্রথমে আত্মীয় সভা ও পরে ব্রাহ্মসভার মাধ্যমে তাঁর উপাসনার পদ্ধতিকে উপস্থাপিত করেন। কিন্তু বেদান্তবাদী রামমোহন ব্রহ্মোপাসনার নীতিকে—যেভাবে প্রচার করেছেন তাতে বলা যায়, যে, তিনি দেশাচারকে ভাঙতে চাইলেও বৈদিক সংস্কার থেকে মুক্ত হতে পারেননি।

রামমোহনের শিষ্য দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা করলেন। পৌত্তলিকতার বিরোধী হ'য়েও দেবেন্দ্রনাথ রক্ষণশীল মনোভাবাপন্ন ছিলেন। তাঁর সংস্কার এত দৃঢ় ছিল, যে, বেদ অপৌরুষের নয়, এ'কথা মানতে তিনি রাজি হননি। তাঁর এই অযৌক্তিক মনোভাবের জন্যই অক্ষয় কুমার দত্তর সঙ্গে তাঁর বিরোধ ঘটে। উত্তরকালে কেশব চন্দ্র সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ যুবকবৃন্দ স্বতন্ত্র হয়ে গিয়ে নববিধান ব্রাহ্মসমাজ গড়ে তোলে।

সংস্কারে আচ্ছন্ন হিন্দু সমাজের গোঁড়ামি ও অন্ধ বিশ্বাসের মূলে সেদিন সবচেয়ে বড় আঘাত হেনেছিল হিন্দু কলেজের নব্যবঙ্গের দল। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে ইংরাজীভাষা ও আধুনিক বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয়। ১৮১৭তেই বাংলা ও বাঙালী সমাজে আধুনিক চিন্তার সূত্রপাত এ'কথা বলা যেতে পারে। ইউরোপে ইতিমধ্যে ফরাসী বিপ্লবের মত ঘটনা ঘটে গেছে। রুশো ও ভলতেয়ারের মানবতার বাণীর সঙ্গে পরিচয় ঘটেছে সকলের। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও অধিকারবোধ সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছে সাধারণ মানুষ। মানুষের চিন্তায় জেগেছে যেমন যুক্তিবাদ, তার কর্মে তেমনি উপযোগিতার বিচার। ইউরোপের সেই নবচেতনার উন্মাদনা বিহ্বল করেছে সমগ্র পৃথিবীকে।

১৮২৮ খৃষ্টাব্দে হিন্দু কলেজের শিক্ষকমণ্ডলিতে যোগ দিলেন অল্পবয়সী এক যুবক, যাঁর রক্তে গর্জন করছে জীবন বিপ্লবের বাণী। হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিওর জন্ম পর্তুগীজ রক্তে। তাঁর মানসিকতাও পুরোপুরি ইউরোপীয়। ধর্মবিশ্বাস তাঁর যেমন ছিল না, তেমনি ছিল না, হিন্দু ঐতিহ্যের কোন ধারণা। কিন্তু অসাধারণ স্বাতন্ত্র্যবাদী সেই যুবক—তাঁর ছাত্রদের মনে বাঁধনছেঁড়ার প্রবল আবেগ জাগিয়ে দিয়েছিলেন। ডিরোজিও নিজে ছিলেন যুক্তিবাদী এবং মানবতায় প্রত্যয়শীল। তাঁর বিপ্লবী মনোভাবের জন্য তাঁকে হিন্দুকলেজ থেকে বিদায় নিতে হ'লেও তাঁর ছাত্ররা হিন্দুধর্ম, সমাজ ও সংস্কারের মূল ধ'রে নাড়া দিয়েছিল। কোঁতে ও হিউমের দার্শনিক আদর্শে অনুপ্রাণিত এই যুবকদের চোখে ধরা পড়েছিল পৌত্তলিকতা ও পৌরাণিক আদর্শের মূঢ়তা। সন্দেহবাদ ও অবিশ্বাস তাদের রক্তগত হওয়ায় তারা উপেক্ষা করল রামমোহনের ব্রহ্মচিন্তা বা একেশ্বর বাদের কল্পনাকে। তাদের একজন দ্বিধা করল না ঘোষণা করতে—**if there is anything that we hate from the bottom of our heart, it is Hinduism.**

ডিরোজিয়ানদের মধ্যে বিদ্রোহ ও আক্রমণের মনোভাব যত প্রবল ছিল, সৃষ্টির বা নতুন আদর্শ গড়ে তোলার প্রেরণা ঠিক ততটাই অনুপস্থিত ছিল। তাই আঘাত করলেও তারা চিন্তার পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি। তাছাড়া ডিরোজিয়ানদের ভাবনা মুষ্টিমেয় কিছু ইংরাজী শিক্ষিত যুবকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্ম সমাজও সেদিন প্রচলিত ধ্যান ও ধারণার বিরুদ্ধে অনেক যুদ্ধ করেছে। রামতনু লাহিড়ী পৈতে ছিঁড়ে ফেলেছেন, কেশব সেন নিজেকে হিন্দু বলে ঘোষণা করতেও অস্বীকার করেছেন। তবুও ব্রাহ্ম সমাজ সাধারণ মানুষের মধ্যে কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। বৃহত্তর হিন্দু সমাজের সঙ্গে কোন যোগ না থাকায়, এবং নিজেদের মধ্যেও চিন্তার পার্থক্য থাকায়, আধুনিক-চিত্ত হয়েও ব্রাহ্ম সমাজ হিন্দুর ধর্মচেতনায় কোন গতিবেগ সঞ্চারিত করতে পারেনি।

[চার]

নদীর অন্তর্বহা স্রোত যেমন তীরের ভাঙনকে ত্বরান্বিত করে, বাঙালী-মানসে চেতনার নবজাগ্রত ধারাও তেমনি সংস্কারের ভিত্তিকেই—ক্রমান্বয়ে ক্ষয় করে চলেছিল। ইউরোপীয় সভ্যতার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি যেমন যুক্তিপ্রবণতা ও উপযোগবাদের সৃষ্টি করেছিল বৈদিক ভারতের ধর্ম ও দর্শনের আদর্শও তেমনি তার দৃষ্টিকে উদার ও আত্মপ্রত্যয়শীল করেছিল। শিক্ষা সাহিত্য স্বাদেশিকতা ও ধর্ম সকল দিকেই বাঙালীমানসের উজ্জীবন ঘটে চলেছিল।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে আমেরিকার শিকাগো শহরে সর্বধর্ম-সম্মেলনে বৈদান্তিক সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ ধর্মের যে ব্যাখ্যা দিলেন, তার মধ্যে তাঁর অসাধারণ চিন্তাস্বাতন্ত্র্য ও আধুনিকমনস্কতার পরিচয় ফুটে ওঠে। তিনি বলেছিলেন—we reject none, neither theist nor pantheist, monist, poly-theist, agnostic nor atheist.

বিবেকানন্দ বললেন— আমরা সকল ধর্মের মানুষকেই শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করি। মানুষের আত্মাই আমাদের কাছে দেবতা।

ধর্মের এই উদারতা এবং সর্বধর্মের সমন্বয় সূত্র তিনি পেয়েছিলেন গুরু রামকৃষ্ণের কাছে। রামকৃষ্ণকে সাধারণ মানুষ জেনেছে কালীসাধক বলে। কিন্তু তিনিই বিবেকানন্দকে অদ্বৈতবাদে দীক্ষা দিয়েছিলেন। তাঁর উপলব্ধির মূল ভাব হ'ল,—যিনি মা, তিনি ব্রহ্ম। হিন্দুসংস্কারের ভেদমূলক সঙ্কীর্ণতাকে তিনি যেমন ভেঙ্গে দিলেন, তেমনি আঘাত করলেন ব্রাহ্ম সমাজের আক্রমণাত্মক মনোভাবকে। রামকৃষ্ণ পুরোহিত শাসিত ও অনুষ্ঠান সর্বস্ব ধর্ম সাধনাকে শুদ্ধাভক্তির পথে ধাবিত করালেন। তাঁর শিষ্য বিবেকানন্দ আরও এগিয়ে এসে বললেন—'এই দেশ আমার স্বর্গ, দেশের মানুষ আমার দেবতা।' ধর্ম তার ভৌগোলিক সীমা ছাড়িয়ে সঙ্কীর্ণ জাতির বেড়া ভেঙে মানুষের ধর্ম হয়ে উঠল।

সমাজে তবুও ব্যক্তিমানবের অস্তিত্ব উপেক্ষিত হয়ে রইল। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় দেবতা আক্ষেপ করে বললেন—

'আমায় ছাড়িয়া ভক্ত চলিল কোথায়?'

সংস্কার মানুষকে এমনই অন্ধ করে যে, দেবতা যদি নিজে এসে বলেন,—'আমি ওই মন্দিরের মধ্যে নেই, আছি রিক্ত মানবতার মধ্যে', তবুও মানুষ মন্দিরে গিয়েই তাঁর পুজো করবে। কাল গঙ্গার সঙ্গে হৃদয়কে যুক্ত করতে হ'লে সংস্কারের পলিমাটি নির্মূল করে ধুয়ে দিতে হবে। আধুনিক মানসিকতা বলতে আমরা বুঝি চেতনার এমন একটি প্রবণতা, যা বিশ্বের পরিবর্তনশীলতার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত রাখতে চায় মানুষের এবং যুগের প্রয়োজনকে স্বীকার করে। বিশেষ কোন চিন্তা বা নিয়ম বা সাময়িকতায় আবদ্ধ নয় বলেই তার চেতনা মানবতার দিকেই ধাবিত হয়।

অন্ধতা ও সংস্কার মানুষকে তার মনুষ্যত্ব থেকে বিচ্যুত করে। বৈদিক যুগে যখন দেবতার প্রীতির জন্য মানুষ তার সকল ধ্যান ধারণা ও কর্মকে যাগ-যজ্ঞ ও বলির মধ্যে কেন্দ্রীভূত করেছিল, তখন মানুষকে তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন করেছিলেন গৌতম বুদ্ধ। মানুষকে তিনি বড়ো করে তুলতে চেয়েছিলেন বলেই তাঁর বাণীতে ঈশ্বরের নাম নেই।

ঊনবিংশ শতাব্দীতেও 'অপার মনুষ্যত্বের অভিমুখে' তাঁর একক জীবনকে যিনি প্রবাহিত করেছিলেন, তাঁর নাম ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। আধুনিক ভারতবর্ষে তিনিই একমাত্র নেতা, যিনি সারাজীবনে একবারও ঈশ্বরের নাম করেননি। কাশীর ব্রাহ্মণেরা তাঁর ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হয়ে বলেছিল—আপনি তবে কি মানেন? উত্তরে বলেছিলেন বিদ্যাসাগর—আমার জনক ও জননীই আমার বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা। এক খৃষ্টান পাদরি তাঁকে পরলোকতত্ত্ব শোনাতে এলে তিনি বলেছিলেন—যাঁরা ইহলোকে মানুষের দুঃখমোচন করতে পারেন না, তাঁদের কাছে পরলোকের সুসমাচার শুনতে তিনি রাজি নন।

বিদ্যাসাগর যে নাস্তিক ছিলেন না, তার পরিচয় তাঁর 'বোধোদয়'। কিশোর ছাত্রদের গ্রন্থে এমন চিন্তা তিনি নিশ্চয়ই সন্নিবিষ্ট করেননি। যা তাঁর ব্যক্তিগত বিশ্বাসের বাইরে। 'বোধোদয়ে' ঈশ্বর সম্বন্ধে বলা হয়েছে—"ঈশ্বর নিরাকার, চৈতন্যস্বরূপ। তাঁহাকে কেহ দেখিতে পায়না; কিন্তু তিনি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছেন।

অথচ এইটুকু মাত্র; তাঁর কাজে বা কথায় ঈশ্বরের নাম কখনও নেননি। কোন কৌতূহলী মানুষের প্রশ্নের উত্তরে একবার শুধু বলেছিলেন— ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপার। যার যেমন বিশ্বাস, সে সেইমত চলবে।

শুধু এই একটি উক্তিতেই ঈশ্বর সম্বন্ধে সব সংস্কার ভেঙে দিয়ে তিনি মানুষের ব্যক্তিচেতনার স্বাতন্ত্র্যকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। মানুষের মন থেকে দেব নির্ভরতা সরিয়ে আত্মপ্রত্যয় জাগাতে চেয়েছিলেন।

বিবেকানন্দ মানুষের মধ্যে ঈশ্বরকে অনুভব করেছেন; আর বিদ্যাসাগর চেতনাকে পুরোপুরী মানবমুখী করতে চেয়েছেন। হিন্দুসমাজের প্রচলিত আচার, অন্ধতা, ও সংস্কারকে তাঁর মানবচেতনার উজ্জ্বল আগুনে তিনি জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন।

এদেশের মানুষের মনে তবু আজও সেই আদিম সংস্কার, সেই ধর্মান্ধতা। আজও ঘরে ঘরে সেই পূজো, মানত, আর পাঁচালি; এবং উদ্ধার কর্তারূপে গুরুদের দাপট। কালীমন্দিরে পাঁঠাবলি আর স্বার্থ পূরণের প্রার্থনা।

এই হল জীবনের চিরকালব্যাপী সংগ্রাম। মন ও মননশীলতার মধ্যে সংগ্রাম। একদিকে মৃত অতীতের বন্ধন, অন্য দিকে জীবনের পথে এগিয়ে চলার দুর্ব্বার বেদনা। এই অন্তহীন সংগ্রামের মধ্যে দিয়েই মানুষ তার মনুষ্যত্বকে পুরোপুরি পাওয়ার জন্য সাধনা করে চলেছে॥

সমাজ

"Despotism and priestcraft taken together, the Hindus in mind and body, were the most enslaved portion of the human race"

—James Mill.

অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতবর্ষকে যারা হঠাৎ এসে দেখেছে, তাদের পক্ষে এমন উক্তি করাই স্বাভাবিক। বিজয়ী ব্রিটিশ শাসক যখন ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হতে চেয়েছিল, তখন তাদের চোখে সমাজের যে বীভৎস রূপ ধরা পড়েছিল, তার প্রতিক্রিয়ার ফলে তারা যদি হিন্দু সমাজকে বর্বরের সমাজ বলে অভিহিত করে থাকে, তবে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। এই বর্বরতা এবং সামাজিক বৈষম্য ও অবিচার যে হিন্দু সমাজের স্বরূপ নয়, সে কথাও বলেছেন ভারত সংস্কৃতি চর্চায় পণ্ডিত ব্যক্তিরা। কিন্তু ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের ভারতবর্ষ প্রাচীন ভারতের ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন ও বিশ্লিষ্ট। মজা পুকুরের মত শুধু পানায় ভর্তি। দীর্ঘদিন ধরে আগন্তুক মুসলমান দস্যুদের অত্যাচার, মোগল, তুর্কী, হুন, তাতার, আরব ও পর্তুগীজ লুণ্ঠনকারীর আক্রমণ, দেশ জোড়া অরাজকতা ও লুঠতরাজ মানুষের মনের প্রসারতাকে নষ্ট করে দিয়েছিল। তার সঙ্গে ছিল দারিদ্র্য আর অজ্ঞতা। সমাজ রক্ষার নামে ব্রাহ্মণ পুরোহিতকুল তাদের সমাজ-সাম্রাজ্যকে পঙ্গু করে রাখবার জন্তে আচার ও সংস্কারের বাঁধনে তার সর্বাঙ্গ জড়িয়েছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর সূচনায় হঠাৎ পশ্চিম পৃথিবীর আলো এদেশের আকাশে পড়ায় হিন্দু সমাজের গলিত ও বিকৃত চেহারা প্রত্যক্ষ হয়ে উঠল। জাতিভেদ, অন্ধ প্রথার অনুশাসন, ধর্মের বিকৃত শাসন, শিশু ও নারীর প্রতি চরম নিষ্ঠুরতা—সেদিনের সমাজে প্রবল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু 'ঘনমেঘে আঁধার হ'য়ে ওঠার মুহূর্তই আকাশের একমাত্র পরিচয় নয়। তবু মেঘ জমতে জমতে যেমন অন্ধকার ঘনিয়ে ওঠে, অন্ধ বিশ্বাস ও লোকাচারের ধোঁয়া তেমনি এক ঘনান্ধকারে সমাজকে আচ্ছন্ন করেছিল।

ভেদ বৈষম্য ও ধর্মান্ধতা কিভাবে সমাজ মানসকে ক্লিষ্ট করে তার পরিচয় হিন্দু সমাজের ইতিহাসেই প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। আমরা দেখেছি, কোন এক সময়ে মানুষ কোন বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে একটি নিয়মের প্রবর্তন করে।

উদ্দেশ্য সাধিত হলেও সেই নিয়ম থেকে যায়। আচার ও অভ্যাসের প্রয়োজন-হীন অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রাখবার জন্য সমাজ রক্ষকরা ধর্মের দোহাই পাড়ে। তখন তার সঙ্গে যুক্ত হয় অজস্র প্রথা ও অনুষ্ঠান, যার বেড়াজালে গোটা সমাজটাই বাঁধা পড়ে।

দুটো উদাহরণ হাতের কাছেই আছে। একাদশ শতাব্দীতে দক্ষিণবঙ্গের রাজা আদিশুর মনে করলেন, বঙ্গদেশে সৎ ব্রাহ্মণ আর নেই। তাই কনৌজ থেকে তিনি শাস্ত্রজ্ঞ ও আচারনিষ্ঠ পাঁচজন ব্রাহ্মণ আনালেন এবং প্রচুর সম্পত্তি ও অর্থ দিয়ে তাদের এদেশেই ধরে রাখলেন। কালক্রমে সেই পাঁচ ব্রাহ্মণের সন্তান-সন্ততির সংখ্যা যেমন বেড়ে গেল, তাদের শাস্ত্রজ্ঞান ও ধর্মনিষ্ঠা সেই পরিমানে বাড়ল না। দ্বাদশ শতকে বাংলার রাজা বল্লাল সেন। তিনি এদের মধ্য থেকে সদ্‌ব্রাহ্মণ বেছে তাদের কৌলীন্যের মর্যাদা দিলেন। বল্লাল সেন কৌলীন্য স্থির করলেন গুণ বিচার করে—

আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্
নিষ্ঠাবৃত্তিস্তপো দানং নবধা কুললক্ষণং ॥
[কুলরাম]

অর্থাৎ যে সব ব্রাহ্মণের মধ্যে আচার, বিনয়, বিদ্যা ইত্যাদি নয়টি গুণই বিদ্যমান, তাঁরাই হলেন কুলীন। এঁদের মধ্যে যাঁরা আবৃত্তি ছাড়া বাকি আটটি গুণের অধিকারী, তাঁরা শ্রোত্রীয়; এবং অন্যরা ভ্রষ্ট বা গৌণ কুলীন। এ ছাড়া স্থানীয় যে সাতশত ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁরা হলেন সপ্তশতী।

কালক্রমে আদান প্রদান অর্থাৎ সমান ঘরে কন্যার বিবাহ দিতে পারার ওপরেই ব্রাহ্মণের কৌলীন্য নির্ভরশীল হল। এর মধ্যে আবার আরও ছত্রিশটি 'মেল' বা 'শ্রেণী'র সৃষ্টি করলেন ঘটক ব্রাহ্মণ দেবীবর। এবারে ব্রাহ্মণের কুল ও মর্যাদা নির্ধারণের উপায় হল সমান মেল বা স্বশ্রেণীতে কন্যাদান হয়েছে কিনা তারই বিচার। এমন স্বশ্রেণীর পাত্র দুর্লভ হওয়ায় একই ব্যক্তির সঙ্গে বহু কন্যার বিবাহ দেওয়া শুরু হ'ল। ধর্ম ও কুলরক্ষায় ব্যাকুল হয়ে কুলীন ব্রাহ্মণ যে কোনপ্রকারে এক কুলীন পাত্রে কন্যাদান করতে ব্যস্ত হ'ল। সে পাত্র বিবাহিত, বৃদ্ধ এমনকি মুমূর্ষু হলেও সৎপাত্র।

উপরোক্ত নয়টি গুণের কোন গুণই যার নেই, জন্মসূত্রে সেও হল কুলীন। শুধু অর্থলোভে সে গণ্ডায় গণ্ডায় বিয়ে করে চললো। সামাজিক কুলীনতা এক ব্যবসায়িক নীচতায় পরিণত হল।

সুরেশচন্দ্র ঘোষ তাঁর Dalhousie in India গ্রন্থে এই কৌলীন্য প্রথার বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন A Kulin could take as many young wives as he could till the last day of his life. Girls were betrothed when a few months old and the infant daughter automatically became a widow.

বিধিনিষেধের বাঁধন সর্বাঙ্গে জড়িয়ে দিয়ে সমাজকে যিনি ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিয়েছিলেন, তাঁর নাম রঘুনন্দন ভট্টাচার্য। পঞ্চদশ শতাব্দীর বঙ্গদেশে তুর্কী ও মোগল সুলতান এবং তাদের সামন্তদের হাতে হিন্দুর ধর্মনাশ, জাতিনাশ এবং নারীধর্ষণ অত্যন্ত সাধারণ ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই অত্যাচার থেকে বাঁচতে এবং রাজানুগ্রহ পেতে কিছু লোক নবাব-দরবারে নিজের কন্যা ও ভগিনীকে উপঢৌকন পাঠাতেন—এমন ঘটনাও প্রচুর। সেদিন ধর্ম রক্ষা, সমাজ রক্ষা এবং নারীর সতীত্ব রক্ষার জন্য সামাজিক অনুশাসনের সৃষ্টি করা হয়। মনুর মত রঘুনন্দনও অষ্টবিংশতি তত্ত্বে যে সব সামাজিক কৃত্যের বিধান দেন, তার পেছনে না ছিল শাস্ত্র, না কোন যুক্তি। যেমন, ব্রাহ্মণ ও শূদ্র এই দুই ভাগে হিন্দু সমাজকে বিভক্ত করলেন তিনি। শূদ্র ও যবনস্পৃষ্ট আহার্য গ্রহণ করলে ব্রাহ্মণের জাতিনাশ ও প্রায়শ্চিত্তের বিধানও তিনি দিলেন। কিন্তু রঘুনন্দনের কুৎসিৎ ও নির্দয় আক্রমণ হল নারী সমাজের ওপর। সতীদাহের অবাধ প্রচলন, অন্যথায় বিধবা নারীর কঠোর কৃচ্ছ্রতা সাধনের বিধান রঘুনন্দনেরই কীর্তি।

পুরোহিতকুলই ছিল এইসব সামাজিক তত্ত্বের ব্যাখ্যাতা। সাধারণ মানুষ দরিদ্র, অশিক্ষিত ও অজ্ঞ। পুরোহিত ও জমিদারকুলের দাপটে সামাজিক বিধিনিষেধগুলি মানুষের গলায় শেকলের ফাঁস হয়ে জড়িয়ে গেল। ধর্মান্ধতা ও লৌকিক আচার আনল শিশু হত্যা এবং নারী হত্যার বিভীষিকা।

সুরেশচন্দ্র ঘোষ তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন—Parents murdered their infant daughters either because they could not afford the marriage expenditure or because they foresaw difficulties in marrying them suitably.

কার্তিক ও পৌষ মাসে গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন দেওয়া সে সময়ে এক পুণ্যের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দেশাচার মানুষকে এমনই অন্ধ করেছে, যে, নিজের সন্তানকেও জলে ডুবিয়ে মারাকে সে কর্তব্য বলে মনে করেছে। রবীন্দ্রনাথের 'দেবতার গ্রাস' কবিতায় এমনই এক ঘটনার কথা রয়েছে। বিধবা যুবতী

মোক্ষদা তাঁর পুত্রপ্রতীম রাখালের শিশুসুলভ জেদে বিরক্ত হয়ে হঠাৎ বলে ফেলেছিল –'চল তোরে দিয়ে আসি সাগরের জলে'। সাগর থেকে ফেরার পথে যখন হঠাৎ ঝড় উঠল, তখন যাত্রীরা ত্রস্ত কণ্ঠে বলে উঠল।

"এই সে রমনী
দেবতারে সঁপি দিয়া আপনার ছেলে
চুরি করে নিয়ে যায়। দাও তারে ফেলে"

দেবতাকে তুষ্ট করার জন্য মাসীর বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে রাখালকে তারা সাগরের উত্তাল গর্ভে নিক্ষেপ করল।

দেবতা প্রসন্ন হবেন, এই বিশ্বাসে কোজাগরী পূর্ণিমার রাতে গঙ্গায় সন্তান বিসর্জন দিত অনেকে। হান্টার-এর Annals of Rural Bengal গ্রন্থে শিশু হত্যার অনেক কাহিনী পাওয়া যায়। শুধু পুণ্যার্জন নয়, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী রোধ করার উদ্দেশ্যেও শিশুবলি দেওয়ার প্রথা ছিল।

এগুলি শাস্ত্রের নির্দেশ নয়, শুধু লোকাচার। শুধু বিশ্বাস যে, দেবতা খুশী হবেন। এই বিশ্বাস মাতৃস্নেহকেও অন্ধ করেছে। উইলিয়াম কেরির চেষ্টায় শিশু হত্যাকে চরম অপরাধ গণ্য করে আইন বিধিবদ্ধ হয় ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে।

আর একটি কুৎসিৎ প্রথা ছিল 'দেবদাসী' করার প্রথা। সুন্দরী বালিকাদের দেবমন্দিরে দান করা হয়। দেবতার নামে উৎসর্গীকৃত এই বালিকাগুলিকে ব্যবহার করা হত মন্দিরের রক্ষক মোহান্ত বা রাজা এবং রাজপুরুষদের মনোরঞ্জনের জন্য। তখন দেবপূজার নামে সে বারবধূ। দেবদাসী করার জন্য অনেক সুন্দরী মেয়ে কিনে নেওয়া হত। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড হার্ডিঞ্জের সময়ে আইন পাশ করে হয় ক্রীতদাস প্রথা নিষিদ্ধ করে।

সমাজের সবচেয়ে বীভৎস ও বর্বর প্রথা ছিল 'সতীদাহ'। সতীদাহ প্রাচীন ভারতেও ঘটেছে কিন্তু সে ত বিরল ঘটনা। হঠাৎ স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হয়ে কোন নারী স্বামীর চিতায় আত্ম-বিসর্জন দিয়েছে তারই কোন ঘটনা। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীতে এসে সতীদাহ সামাজিক বিধান হয়ে উঠল। রঘুনন্দনের অষ্টবিংশতি তত্ত্বে বিধান দেওয়া হল, যে, সহমরণই সতী নারীর একমাত্র কর্তব্য। যে নারী স্বামীর চিতায় পুড়ে মরবে, সে অক্ষয় স্বর্গ লাভ করবে। সাধারণ মানুষ শাস্ত্র পেত না। রঘুনন্দনের উদ্ভট শ্লোকের সত্য নির্ধারণ করার ক্ষমতাও তাদের হাতে ছিল না। ধর্মের নামে যা বলা হত, তাদের তাই মেনে নিতে হত। তাদের ধর্মবিশ্বাসও এত

প্রকল ছিল যে, তারা নির্বিধায় মেনে নিল,—নারী যদি সতী হয় তবে তাকে স্বামীর চিতাতেই মরতে হবে।

কিন্তু স্বেচ্ছায় আগুনে দগ্ধ হ'য়ে মৃত্যু বরণ করা কোন সুস্থ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই পুণ্যলোভী হিন্দুসমাজে বিধবা নারীকে জোর করে 'সতী' করার নিয়ম চালু হ'ল। বাপ মেয়েকে, ভাই বোনকে এমন কি ছেলে মাকে হাত পা বেঁধে জ্বলন্ত চিতায় ফেলে দিত। অর্দ্ধদগ্ধ অবস্থায় কোন নারী যাতে পালাতে না পারে, তার জন্য হিতৈষী আত্মীয়রা লাঠি হাতে চিতার পাশে পাহারা দিত।

শ্রীঅমিতাভ মুখার্জী তাঁর Reform and Regeneration in Bengal গ্রন্থে এবং শ্রীগোরাচাঁদ মিত্র তাঁর 'সতীদাহ' গ্রন্থে এমন অজস্র ঘটনার উল্লেখ করেছেন।

১৮২০ খ্রীষ্টাব্দেও বার বছর বয়সের এক শিশু বালিকাকে তার স্বামীর চিতায় পুড়িয়ে মারা হয়। নদীয়া জেলার বাগনাপাড়া নিবাসী ব্রাহ্মণ অনন্তরামের মৃতদেহের সঙ্গে তার ৩৭টি স্ত্রীকে তিন দিন ধরে পুড়িয়ে সতী করা হয়।

সংস্কার মানুষকে যে বাঘের চেয়েও হিংস্র ও নিষ্ঠুর করে তার প্রমাণ এই দেশের অগণিত কাহিনী।

সুপ্রিম কোর্টের এক নির্দেশে সুপ্রিম কোর্ট এলাকার মধ্যে (হুগলী নদী ও মারাঠা ডিচ্ এর মধ্যবর্তী অঞ্চল) সতীদাহ নিষিদ্ধ করা হয়। অথচ তারপরেও হুগলী নদীর অপর পারে ১৮১৫ থেকে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ১৫২৮টি সতীদাহর হিসেব পাওয়া যায়।

রঘুনন্দনের সমসাময়িক ছিলেন চৈতন্য। তিনি প্রবল বিরোধিতা করেছেন সতীদাহর। মোগল সম্রাটদের অনেকেও এই প্রথার নিন্দা করেছেন। কিন্তু ধর্মান্ধতা হিন্দু সমাজকে এমনভাবে অভিভূত করেছিল, যে, সংস্কার-এর নিষ্ঠুরতা থেকে মুক্তি পেতে সমাজের অনেক সময় লেগেছে।

সতীদাহর বীভৎসতা শাসকগোষ্ঠির অনেককেই চমকে দিয়েছিল। ভারতপ্রেমী উইলিয়াম কেরী এই যুক্তিহীন সংস্কারের বিরুদ্ধে শাসককুলকে সচেতন করতে চেয়েছেন। সুপ্রীম কোর্ট ও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের অভিমত এ ব্যাপারে চাওয়া হলে তিনি একটি লিখিত বিবৃতিতে (১৮১৭ খ্রীঃ) বলেন—

হিন্দুশাস্ত্রের কোথাও সহমরণ বাধ্যতামূলক নয়। বরং আত্মনিগ্রহ ও আত্মহত্যাকেই পাপ বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

এর পরই সতীদাহর বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হলেন রামমোহন রায়। রামমোহন তাঁর পত্রিকা 'সংবাদ কৌমুদী'তে এ বিষয়ে লিখতে শুরু করলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সংস্কারের অন্ধত্বকে ভেঙে দেওয়া এবং মানুষকে সচেতন করে তোলা। রামমোহন নিজে শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন। শাস্ত্র থেকে উদ্ধৃতি তুলে তিনি দেখাতে চেয়েছিলেন যে, সহমরণে শাস্ত্রের সমর্থন নেই। এমন কি মনু, যিনি নারীর বিপক্ষেই শুধু বলে গেছেন, তিনিও বলেছেন যে, সহমরণ নয়, ব্রহ্মচর্যই বিধবা নারীর পক্ষে শ্রেয়। জনমত সংগঠনের জন্য রামমোহন প্রথমে বাংলায় ও তারপরে ইংরাজীতে তাঁর প্রতিবেদনকে সকলের কাছে তুলে ধরেন।

শিক্ষিত হিন্দুসমাজ সেদিনও ভাবতে পারছিল না যে সতীদাহ এক আদিম মনোবৃত্তিজাত, বর্বরোচিত প্রথা। রাধাকান্ত দেবের মত লোকও সতীদাহকে সমর্থন করে গেছেন। সংস্কার মানুষকে এমনভাবে অন্ধ করে যে, যুক্তির কোন আবেদন আর তার কাছে পৌঁছায় না। গ্যালিলিও গ্যালিলি যেদিন বলেছিলেন, সূর্যের চারপাশে পৃথিবী ঘোরে, সেদিন তাঁর প্রাণসংশয় ঘটেছিল। রামমোহনকেও তাঁর দেশের লোক বিধর্মী বলে তিরস্কার করেছেন। অথচ রামমোহন হিন্দুশাস্ত্রকে জানতেন বলেই শাস্ত্রের বিকৃতিকে দূর করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু যুক্তি বা সত্যের দোহাই দিয়ে সংস্কারকে নাশ করা যায় না।

হয়ত রামমোহনের নিজের মনেও দ্বিধা ছিল। তাই বড়লাট বেণ্টিঙ্ক্ যেদিন সতীদাহ নিষিদ্ধ করে আইন প্রণয়ন করতে চাইলেন, সেদিন রামমোহনের সহায়তা তিনি পান নি। বেণ্টিঙ্ক্ বুঝেছিলেন, যে অন্ধতার কাছে সহৃদয় যুক্তির কোন দাম নেই। তাই কঠোর আইনের ব্যবস্থা করে সতীদাহর মত কলঙ্কজনক নিষ্ঠুর প্রথার উচ্ছেদ করেছিলেন ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে।

সতীদাহ বন্ধ হলেও হিন্দুসমাজে নারী-নির্যাতন বন্ধ হয়নি। রঘুনন্দনের অষ্টবিংশতি তত্ত্ব হিন্দুসমাজে গীতার মত মান্য ছিল। মনু থেকে রঘুনন্দন, যাঁরা সমাজের বিধায়ক ছিলেন তাঁদের সকলেরই মনোভাব নারী জাতির প্রতি অতি কঠোর ছিল। নারীসমাজ নিঃশব্দে অপেক্ষা করেছে এমন একজন মানুষের জন্য, যিনি নারীকে তার যন্ত্রনা ও অবমাননা থেকে মুক্ত করবেন। রামমোহনকে আধুনিক মানসিকতার জনক বলা হয়ে থাকে। কিন্তু রামমোহন যে পুরোপুরি সংস্কারমুক্ত ছিলেন, এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করলেও উপাসনার জন্য তিনি যেমন ব্রাহ্মসভার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন,

সতীদাহের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেও বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধেই তেমনি মত পোষণ করেছেন। 'পথ্য প্রদান' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন—

"বিধবার বিবাহ তাবৎ সম্প্রদায়ে অব্যবহার্য্য হইয়াছে। সুতরাং সদ্ব্যবহার করাইতে পারে না।"

রামমোহন মদ্যপান বা মাংস ভোজনের বিরুদ্ধে কথা বলেন নি, বলেছেন বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধে। সংজাত সংস্কার ছিল বলেই তিনি মুখে জাতিভেদের নিন্দা করেছেন, কিন্তু ব্যবহারিক জীবনে জাতিভেদ মেনে চলেছেন। তাঁর বিশিষ্ট বন্ধু ও সহকর্মী Adam রামমোহন প্রসঙ্গে লিখেছেন—All the rules in the present state of Hindu Society he finds it necessary to observe, relate to eating and drinking. He must not eat the food forbidden to brahmins nor with persons of a different religion from Hindu or of different caste or tribe of his own.

আসলে প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা এত গভীর ছিল যে, যুক্তিবাদী হয়েও রামমোহন সংস্কার মুক্ত হতে পারেন নি। পরবর্তী যুগে কেশবচন্দ্র সেন প্রাচীন ধর্মীয় সংস্কার থেকে ব্রাহ্ম সমাজকে মুক্ত করবার চেষ্টা করেছিলেন বলেই দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ হয়। কেশবচন্দ্র উপবীত বর্জন করার জন্য সকলকে যেমন আহ্বান জানান, নারীকে সমান অধিকার দেওয়ার জন্যও তেমনি। অসবর্ণ বিবাহকে আইনের স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য কেশবচন্দ্রই চেষ্টা করেছেন।

কিন্তু এ সমস্তই বিক্ষিপ্ত প্রচেষ্টা। প্রচলিত আচার ও অনুষ্ঠানের প্রতি অন্ধ আকর্ষণ তখন সমাজের সর্বস্তরেই বর্তমান। নির্বোধ প্রথা নির্ভরতা এবং যুক্তিহীন বিশ্বাসপ্রবণতাকে সরিয়ে চিন্তাকে স্বচ্ছ করে তোলার জন্য এমন মানুষের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল, যিনি চিন্তায়, কর্মে ও নিষ্ঠায় পরিপূর্ণ আধুনিক হবেন; সমাজকে যিনি বিচার করবেন মানুষের প্রয়োজনের ও উপযোগের কষ্টিপাথরে যাচাই করে।

ইতিহাস তার নিজের প্রয়োজনেই নেতার সৃষ্টি করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলাও খুঁজছিল পরিপূর্ণ আধুনিক একটি মানুষ যাঁর চিত্ত সংস্কার মুক্ত এবং যাঁর হৃদয় মানবিকতার বোধে আর্দ্র। সমাজকে তার সকল সংস্কার ও আচারনিষ্ঠতা থেকে মুক্ত করে মানবসচেতন করে তুলবার জন্যই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা ও বাঙালী সমাজের কথা একবার ভেবে নিই।

সাধারণ হিন্দুর মধ্যে তখন অখণ্ড প্রতাপ রঘুনন্দন ভট্টাচার্য ও দেবীবর ঘটকের। শিক্ষিত হিন্দু রাধাকান্ত দেব আধুনিকমনস্ক হয়েও দেশাচার ও সংস্কারের বিরুদ্ধে যেতে রাজি নন। ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতিষ্ঠাতা দেবেন ঠাকুর নারীর অধিকার সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন; তবু তিনিও রক্ষণশীল মনোভাব বর্জন করতে পারেন নি। অন্যদিকে রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো লোকেরা হিন্দু সমাজকেই ভেঙ্গে ফেলতে সচেষ্ট। খ্রীস্টধর্ম ও ইংরাজী কালচার মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছে 'নব্য বাংলা'র যুবকদের। এরই মধ্য দিয়ে নিঃশব্দে আত্মবিকাশ ঘটেছে সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণ ঈশ্বরচন্দ্রের।

রামমোহনের মতো ঈশ্বরচন্দ্রও সংস্কৃত ও ইংরাজী—দুই ভাষাতেই অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে মার্শাল প্রমুখ ব্রিটিশ সিভিলিয়ানদের সান্নিধ্য তাঁকে নতুন দিগ্‌দর্শন দিয়েছিল। বিদ্যাসাগরের মন প্রাচীন ভারতের প্রজ্ঞায় যেমন উদ্ভাসিত, আধুনিক ইউরোপের জ্ঞানালোকে তেমনি পরিশীলিত।

মনে রাখা দরকার, সমগ্র ইউরোপেই ইতিমধ্যে চিন্তাবিপ্লব ঘটে গেছে। ফরাসী বিপ্লবের উন্মাদনা সকল মানুষের মনকেই স্পর্শ করেছে। রুশোর মানবিক চেতনা এবং ভল্‌তেয়ারের বিশ্বজনীনতা নিশ্চয়ই বিদ্যাসাগরকেও অনুপ্রাণিত করেছিল। ইউরোপের দর্শন, সাহিত্য ও ইতিহাস তিনি যে সযত্নে পাঠ করেছিলেন, তা তাঁর গ্রন্থাগার দেখলেই বোঝা যায়।

কিন্তু রামমোহনের মতো বিদ্যাসাগর প্রাচীন ভারতকেই আবার উজ্জীবিত করতে ব্যস্ত হন নি। আধুনিক পৃথিবীর জীবনালোকে হিন্দুসমাজকে তিনি নতুন করে গড়তে চাইলেন। নতুন কিছু গড়তে গেলে প্রাচীন চিন্তার সঙ্গে কোন গোঁজামিল দেওয়া যায় না, এ বোধ তাঁর ছিল বলেই বলেছিলেন—

"পুরাতন প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি বিশিষ্ট মানুষের চাষ উঠাইয়া দিয়া সাতপুরু মাটি তুলিয়া ফেলিয়া নতুন মানুষের চাষ করিতে পারিলে, তবে এদেশের ভাল হয়......"

অনেক দুঃখে ও বেদনায় বিদ্যাসাগর এত কঠোর উক্তি করেছিলেন। যে হিন্দু সমাজের মধ্যে তিনি পালিত, সেই সমাজের কোন্ চেহারা তাঁর চোখে পড়েছিল? তিনি দেখেছিলেন, এ দেশের মানুষে মানুষে যেমন ভেদ, পুরুষ ও নারীর মধ্যেও তেমনি বৈষম্য। উচ্চবর্ণের মানুষের কাছে শূদ্র ছিল প্রায় অস্পৃশ্য। তার সংস্কৃত শিক্ষার বা ধর্ম ও দর্শন চর্চার কোন অধিকার ছিল না। নারীর শিক্ষার সুযোগ বা অধিকার কোনটাই ছিল না। বিধবা বালিকার দুঃখ্য অপা

কারও বুকে একটি দীর্ঘ নিশ্বাসও তুলত না। আর শিশু বালিকার বিবাহ ত শাস্ত্রসম্মতই ছিল। এ বিষয়ে কাশ্যপের ভাষ্য—

'পিতুর্গেহে চ যা কন্যা রজঃ পশ্যত্যসংস্কৃতা
ভ্রূণহত্যা পিতুস্তস্যা সা কন্যা বৃষলী স্মৃতা।'

কৌলিন্য প্রথা ও বহু বিবাহের অবসান এবং বালিকা বিধবার পুনর্বিবাহের অধিকার এই নিয়ে তাঁর সংগ্রাম শুরু হয় ১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দে। বলা বাহুল্য সমগ্র হিন্দুসমাজ সেদিন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল তাঁর ওপরে। বিদ্যাসাগর একদিকে যেমন যুদ্ধ করেছেন রক্ষণশীল পণ্ডিত সমাজের সঙ্গে অন্যদিকে তেমনি উদ্বুদ্ধ করেছেন শিক্ষিত মানুষের হৃদয়কে। সঙ্গে সঙ্গে জাগ্রত করেছেন শাসক শক্তিকে। তাঁর অসাধারণ প্রয়াসে বিধবা বিবাহ সম্পর্কিত আইন পাশ হয়েছে ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দে। স্ত্রীশিক্ষার প্রসারে তিনি সাহায্য পেয়েছেন অনেকের কিন্তু তাঁর ঘনিষ্ঠতম বন্ধুও তাঁর শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে, যখন তিনি বহু বিবাহ রোধের লড়াইয়ে নেমেছেন। তারানাথ তর্কবাচস্পতি যেমন প্রবল প্রতিকূলতা করেছেন, তেমনি নির্মম সমালোচনা করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর বঙ্গদর্শনের পৃষ্ঠায়।

নারীর পুনর্বিবাহের অধিকার আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হলেও সমাজ যতদিন সে অধিকারকে মেনে না নিচ্ছে, ততদিন পরাধীনতা থেকে নারীর মুক্তি নেই। বিদ্যাসাগর এ সত্যকে অনুধাবন করেছিলেন বলেই বাল্যবিধবার বিবাহকে সমাজে গ্রহণযোগ্য করাতে তিনি সংগ্রাম শুরু করেছিলেন। সকল বাধা ঠেলে একটি একটি করে বিধবা বিবাহ দেওয়ার কাজে তাঁর ব্যক্তিগত ঋণ একসময়ে বিরাশি হাজার টাকায় পৌঁছেছিল। নিজের মা ও ভাইদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে একমাত্র পুত্রের বিবাহ দিয়েছেন বিধবা বালিকা ভবসুন্দরীর সঙ্গে। তাঁর জীবন ও আদর্শের মধ্যে কোন ফাঁক ছিল না। আত্মীয় স্বজনের বিরাগ, বন্ধু বিচ্ছেদ, সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধ সমালোচনা—কিছুই তাঁকে উদ্দিষ্ট পথ থেকে সরাতে পারে নি।

জাতিবৈষম্যও তিনি মানেন নি। সংস্কৃত শিক্ষায় আগে বর্ণহিন্দুর শুধু অধিকার ছিল। বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের দ্বার সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন।

ভারতবর্ষে বিদ্যাসাগরই প্রথম সমাজে নারীর পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করেছেন। তিনিই প্রথম পতিতা নারীরও যে মানবিক অধিকার আছে, তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

ব্রাহ্ম সমাজের নেতা কেশবচন্দ্র সেনের চেষ্টায় অসবর্ণ বিবাহ আইনগ্রাহ্য হয়। সমাজে আজ বহু বিবাহ শুধু নিন্দনীয় নয়, আইন বিরুদ্ধ। পিতার সম্পত্তিতে পুত্র কন্যার সমান অধিকার। তবুও বলতে বাধা নেই, যে, হিন্দু সমাজে রক্ষণশীলতার বাঁধন আজও সুদৃঢ়। সমাজে যে সাম্যনীতি ইসলাম ধর্মকে বিশ্বজনীন করেছে, তার অভাবে হিন্দুসমাজ আজও সঙ্কীর্ণ পরিধিতে আবদ্ধ। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, কেশব সেনের সাধনা সমাজকে মানবিকতায় উদার করে তুলতে পারেনি। আজও পৌত্তলিকতা ও বহু দেব-দেবীর পূজা যেমন সমাজে প্রচলিত, জাতিভেদ তেমনি অবাধ। মানবিকতার চেতনা সমাজচিত্তে যে প্রবাহ আনে, সংস্কারের পলি তাকে প্রতিমুহূর্তে রুদ্ধ করে।

সমাজের সমস্ত সংস্কারকে নির্মূল করে ধর্মশাসিত সমাজকে মানুষের সমাজ করে না তোলা পর্যন্ত এই নিরন্তর সংগ্রামের শেষ নেই।

সাহিত্য

দশম একাদশ খৃষ্টাব্দের বাংলাদেশে সমাজ ও মানুষের মন পুরোপুরি ধর্মনির্ভর ছিল বলেই জানা যায়। বাংলা সাহিত্যের সেই আদি যুগে চর্যাপদগুলি লেখা হয়েছিল ধর্মসাধনা ও আধ্যাত্মিক উপলব্ধির ভিত্তিভূমিতে। কাব্য রচনার উদ্দেশ্য তখন দর্শন চিন্তা এবং পরমার্থিক মুক্তির দিকে মনকে আকর্ষণ করা। লৌকিক ধর্ম ও আধ্যাত্মিক চিন্তায় মন যখন আচ্ছন্ন, সেই সময়েও এমন একটি দুটি দোহা আমাদের চোখে পড়েছে যা' আজও বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। যেমন—

কিন্তহ দীবেঁ কিন্তহ নিবেজ্জঁ
কিন্তহ কিজ্জই মন্তহ সেবৃবেঁ।
কিন্তহ তিত্থ তপোবন জাই
মোক্খ কিং লব্ভই পাণী হ্নাই।
এসো জপহোমে মণ্ডল কম্মে
অণুদিন অচ্ছসি বাহিউ ধম্মে।
তো বিণু তরুণি নিরন্তর নেহেঁ
বোধি কি লব্ভই প্রেণ বিণ দেহেঁ।

অর্থাৎ,

দীপ জ্বালিয়ে কিম্বা পূজোর নৈবেদ্য সাজিয়ে তোর কি হবে? মন্ত্র জপ করে আর তীর্থে তপোবনে গিয়েই বা তোর কি লাভ? জলে চান করলেই কি মুক্তিলাভ হয়। ওরে তরুণি, তুই শুধু জপতপ ও ধর্ম নিয়েই দিন কাটিয়ে দিলি; মানলিনা যে, প্রেম ছাড়া এই দেহের মুক্তি নেই।

এই ছোট্ট দুটি দোহার মধ্যে আধ্যাত্মিক চিন্তা নয়, কবির নিজের মনের কথাই বড় হয়ে উঠেছে। সমাজের ধর্ম ও সংস্কারকে ভেঙে হৃদয় নিজেকে প্রকাশ করেছে। সে যুগেই একজন কবি বলতে পেরেছেন—ধর্ম আচরণ, মঙ্গল কর্মের ক্রিয়া,—এসব নেহাতই বাইরের জিনিস। হৃদয়ের উন্মোচন প্রেমের মধ্যে; মানুষের মুক্তিও সেখানেই।

চেতনার এই অবাধ অনুভবের স্ফুরণ শুধু কাব্য ও সাহিত্যকে অবলম্বন করেই জাগে। সাহিত্যের বিবর্তনের মধ্যে দিয়েই জাতির ও সমাজের ধর্ম, দর্শন এবং সংস্কৃতি চিন্তার ধারাবদল রূপায়িত হয়। ধরা পড়ে সমাজের আশা, আকাংক্ষা ও প্রগমনের ছবি।

আমরা আগেই দেখেছি যে, মানুষ বা মানুষের সমাজ তার সহজাত বিশ্বাস, ধর্মচিন্তা ও অভ্যাস থেকে পুরোপুরি মুক্তি কখনো পায় না। শীতের সকালে প্রবল কুয়াশায় দৃষ্টি যখন আচ্ছন্ন থাকে, সূর্যের প্রথম রক্তিমাভা তখন কারো চোখে পড়ে না। পিতৃপুরুষের সুদীর্ঘকালের সংস্কার রক্তের মধ্যে দিয়ে যেমন সন্তানের দেহে সংক্রামিত হয়, চারধারের লৌকিক বিশ্বাস ও সামাজিক ক্রিয়াপ্রকরণ তেমনি তার অভ্যাসকে দৃঢ় করে। তবু এর মধ্যে দিয়ে তার চেতনার আকাশে আলোর রঙ লাগে। কোন কোন মানুষ নতুন নতুন ভাবে ভাবতে চেষ্টা করে: প্রচলিত ধ্যান ও ধারণার বাঁধন ছিঁড়ে জীবনকে তার চেতনার আলোকে জানতে চায়। এই চেতনাই তাকে প্রগতিশীল করে। মানুষের ব্যক্তি চেতনার এই সহজ উন্মোচনকেই আমরা আধুনিক মানসিকতা বলি।

পরিবর্তন যখন আসে তখন নানাদিক দিয়ে নানাভাবে তা ব্যক্ত হয়। মানুষের চিন্তার বিষয় যেমন বদলে যায়, তেমনি বদল হয় তার জীবন সম্পর্কিত ধারণাগুলির। যে এতকাল দিনের আলোকে আকাশ দেখেছে, সে এবারে নক্ষত্রজ্বলা রাতের আকাশকে দেখতে চায়। জীবন যার কাছে আনন্দানুভব ছিল, সে দেখে বেদনায় হৃদয় নিষ্পেষণ করা কঠিন দুঃখের রূপ।

কবি ও শিল্পী তার হৃদয়ের উপলব্ধিকে সকলের করে' প্রকাশ করতে চায়। জীবনের মূল্যবোধই যার কাছে নতুন হয়ে ওঠে, সে পুরনো অভ্যস্ত ধরণে নিজেকে আর মেলে ধরতে চায় না। সে মুক্তি চায় আচরিত প্রথা থেকে। আধুনিক কবি একদিকে যেমন ভাঙে তার দীর্ঘদিনের বিশ্বাসের বাঁধনকে নিজেকে তেমনি মুক্ত করে নেয়, প্রকাশের প্রচলিত ধারা থেকে। তার হাতে ভেঙে যায় ছন্দের বেড়া, বদলে যায় উপমার পৌনঃপুনিকতা, শব্দকে সে পাথরে ঘষে শাণিত করে নেয়, যাতে সহজে লক্ষ্যভেদ হয়। কিন্তু এ'ত বহিরঙ্গের কথা। আসলে এইসব পরিবর্তনগুলি তখনই ঘটতে থাকে যখন শিল্প ও সাহিত্য চেতনায় নতুন আলোর স্পর্শ লাগে। চেতনার এই ধারা বদলের মূলে থাকে ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রের পরিবর্তন অথবা বহিরাগত অন্য কোন সংস্কৃতির সংঘাত। পঞ্চদশ শতাব্দীতে এবং ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগেব বাঙালী সমাজ ছিল পৌরাণিক সংস্কারে পুরোপুরি আচ্ছন্ন। একদিকে যেমন অজস্র দেবদেবীর কল্পনায় মন জড়িয়ে ছিল, অন্যদিকে তেমনি সামাজিক ও লৌকিক আচারে চিন্তা পঙ্গু হয়ে পড়েছিল। সমাজে নারীর সতীত্ব রক্ষার জন্য যারা সতীদাহের বিধান দিয়েছিল, স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের বাইরে প্রেম বা পরকীয়া প্রেম তাদের কাছে অকল্পনীয়। যেরূপ

শতকে চৈতন্যদেব যেমন বিপ্লব আনলেন সমাজে—মানুষকে জাতি, ধর্ম ও লৌকিক বিচারের ঊর্ধ্বে স্থাপিত করে, বৈষ্ণব কবিরাও তেমনি করে মানুষকেই বড় তুললেন—তার প্রেম, বেদনা ও বিরহের কাহিনীকে কাব্যের বিষয়বস্তু করে। শ্রীরাধা বৈষ্ণব কাব্যে সাধারণ নারীর মতই দুঃখকাতরা ও সুখে উদ্বেলা। বৈষ্ণব কবির হাতে এই দেহজ আকর্ষণ এক অতীন্দ্রিয় উপলব্ধির আনন্দে সর্বজনীন ও মহৎ হয়ে উঠেছে। তাই পাঁচশো বছর আগে বৈষ্ণব কবিদের রচিত পদগুলি প্রাচীন হয়েও আজও আধুনিক মনকে নাড়া দেয়। পরবর্তী যুগের মঙ্গলকাব্যগুলি একান্তভাবেই প্রাচীন। এমনকি অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্দ্রের "অন্নদামঙ্গল"ও আজকের পাঠকের কাছে শুধু পৌরাণিক বলে নয়, অশ্লীল এবং আদর্শহীন বলে মনে হয়। অন্নদামঙ্গলের বিষয়বস্তুতে একদিকে যেমন দেবদেবীর মাহাত্ম্য কীর্তনের কথা, অন্যদিকে তেমনি নীতিহীন ব্যক্তিচরিত্রকে উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে দেবমাহাত্ম্যে বা দেবী মহিমায় বড় করে তুলবার চেষ্টা।

অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে ভারতচন্দ্র ছাড়া উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব আর নেই। বস্তুতঃ অষ্টাদশ শতাব্দী শুধু বাংলাদেশ নয় সমগ্র ভারতবর্ষেই এক সর্বাঙ্গীন অবক্ষয়ের যুগ। মানুষের জীবনবোধ সবদিক থেকেই এই শতকে বিপর্যস্ত হয়েছে। কিন্তু এই শতকের শেষেই এক নতুন শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংঘাত ঘটেছে বাঙালী মানসে। শিক্ষা সমাজচেতনা ধর্মাদর্শ এবং জীবনানুভবের ধারাতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য—ভারতবর্ষীয় এবং ইউরোপীয় সভ্যতার সংঘর্ষের ফলস্বরূপ acculturation অর্থাৎ সংস্কৃতির রূপান্তর ঘটেছে। ১৭৫৭ তে ইংরাজ বণিকের হাতে বাংলার অবক্ষয়িত এবং পরাভূত আত্মার আত্ম বিক্রয়ে সেই সংঘর্ষের সূচনা। ১৭৮৪ তে এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা, ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম এবং ১৮১৭তে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা এবং এক মহানগরী রূপে কলকাতার আত্মপ্রকাশ সংস্কৃতির এই রূপান্তরকে ত্বরান্বিত করল। ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে আধুনিক ইউরোপের দর্শন ও সাহিত্য যেমন উদ্বুদ্ধ করল বাঙালীমানসকে, ফরাসী বিপ্লব, রুশো ও ভলতেয়ারের বাণী তেমনি উজ্জীবিত করল তাকে এক নতুন জীবন চেতনায়। "The literary history of Bengal in the 19th century is really the history of the influence of European ideas on Bengali thought."*

---

* Dr. S. K. De—Bengali Literature in the Nineteenth century, Page 55

অষ্টাদশ শতকের বাংলা সাহিত্য মানে মঙ্গলকাব্য, কবির গান বা পাঁচালি; দেবদেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনা এবং স্তুতি। মানুষের কথা তখনো সাহিত্যে কোন প্রাধান্য পায়নি। চিন্তার মধ্যে যুক্তি বা বিচারবুদ্ধি স্থান পায়নি। দেশপ্রেম বা জাতীয়তার অনুভব তখনো হৃদয়ে জাগ্রত হয়নি। ভারতচন্দ্র তাঁর 'অন্নদামঙ্গলে' ভবানন্দ মজুমদারকেও ধার্মিক ও দেবাশ্রিত বলে বর্ণনা করেছেন। রামায়ণের বিভীষণ বা অন্নদামঙ্গলের ভবানন্দ যে স্বজাতিদ্রোহী এ বোধ তখন কোন কবি বা সাহিত্যিকের মনে জাগে নি।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে পদার্পণ করেই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে কেরির মত মিশনারি ভারত প্রেমিক পণ্ডিতের সান্নিধ্যে এবং হিন্দু কলেজে ডিরোজিওর মত যুক্তিপ্রেমিক ইউরোপীয় শিক্ষাবিদের আবির্ভাবে বাংলাদেশের ইংরাজী শিক্ষিত মানুষ এক নতুন চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে উঠলো। বাংলা গদ্য তার সূতিকাগৃহের দ্বার অতিক্রম করে বাইরের আলোতে এসেছে। রামমোহন রায় ও তাঁর পরে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মত আধুনিক মনোভাবাপন্ন শিক্ষিত মানুষ গদ্য সাহিত্যকে সৃষ্টি করার কাজে মন দিয়েছেন। সাহিত্যে যুক্তিবাদ ও বৈজ্ঞানিক মানসিকতার সূচনা দেখা দিয়েছে। এবং ইউরোপীয় সভ্যতা ও দর্শনের সবচেয়ে বড় কথা, মানব-চিন্তার সাড়া তখন বাংলা সাহিত্যে অঙ্কুরিত হতে শুরু করেছে। বাংলা কাব্য এবং সৃষ্টিমূলক সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে নতুন আদর্শবোধের যে দিগন্ত খুলে গেল, তারই আলোকে নবযুগের অগ্রদূত এক অসাধারণ কবির দেখা পাওয়া গেল; তাঁর নাম মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

"মেঘনাদবধ কাব্য" এবং 'বীরাঙ্গনা' কাব্যের রচয়িতা মাইকেল মধুসূদনই যে বাংলা কাব্যের ইতিহাসে সবদিক দিয়ে আধুনিক মানসিকতার সৃষ্টি করেছেন, একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। হিন্দু কলেজের ছাত্র মধুসূদন রামায়ণ ও মহাভারতের সঙ্গে গ্রীক, রোমক ও ইংরাজ কবিদের কাব্য পাঠ করেছেন। হোমার, মিল্টন ও ওভিদ তাঁর কাব্যের আদর্শকে সৃষ্টি করেছে। ব্যক্তিগতভাবে হিন্দুধর্মের বেড়া ভেঙে খৃষ্টান হয়েও ভারতীয় অদর্শ ও জীবনবোধে তিনি বিশ্বাসী। দ্রুতগামী অশ্বের মত প্রচলিত চিন্তা ও মানসিকতার বেড়া ডিঙিয়ে তিনি দৌড়োলেন। পয়ারের ফর্ম ভাঙলেন, কাব্যের শব্দগুলিকে নতুন করে গড়ে নিলেন। রামায়ণ ও মহাভারত থেকে কাহিনী নিলেও সে কাহিনীকে নিজের চিন্তার ছাঁচে গড়ে নিলেন। হিন্দুর আদর্শ পুরুষ রামচন্দ্রকে দুর্বল, সংস্কার ভীরু, ও নির্জীব বলে মনে হ'ল তাঁর। রাক্ষস হিসাবে বর্ণিত রাবণ তুলনায় অনেক

বেশী মানবিক এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে একটি চিঠিতে মধুসূদন লিখলেন—I despise Rama and his rabbles; but the idea of Ravana elevates and kindles my imagination.

রামায়ণের চরিত্রগুলিকে প্রচলিত চিন্তার বাইরে সম্পূর্ণ নিজের দৃষ্টি দিয়ে বিচার করেছেন মধুসূদন। দেবতার আশ্রিত এবং অবতার রূপে বর্ণিত রামের চেয়ে পৌরুষদীপ্ত রাবণকেই তাঁর আদর্শচরিত্র বলে মনে হয়েছে।

রামায়ণের পরমধার্মিক বিভীষণকে বিশ্বাসঘাতক রূপেই দেখিয়েছেন কবি। গোপন পূজামন্দিরে গুপ্তপথ দিয়ে লক্ষ্মণকে নিয়ে আসার জন্য বিভীষণকে মেঘনাদ যে ভাষায় ভৎর্সনা করেছেন, বাংলা সাহিত্যে তা অভূতপূর্ব।

......হায় তাত, উচিত কি তব
এ কাজ, নিকষাসতী তোমার জননী,
সহোদর রক্ষঃ শ্রেষ্ঠ? শূলি শম্ভু নিভ
কুম্ভকর্ণ? ভ্রাতৃস্পুত্র বাসববিজয়ী,
নিজগৃহপথ তাত, দেখাও তস্করে?

জাতিদ্রোহী বিভীষণকে তিনি পিতৃব্য বলে মার্জনা করেন নি, তিরস্কার করেছেন তীব্র বেদনায়। মেঘনাদের কণ্ঠে স্বাজাত্যবোধ এবং জাতীয়তার বাণী।

...... কোন্ ধর্মমতে, কহ দাসে, শুনি,
জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতি, এ সকলে দিলা
জলাঞ্জলি? শাস্ত্রবলে গুণবান যদি
পরজন, গুণহীন স্বজন, তথাপি
নির্গুণ স্বজন শ্রেয়ঃ, পরঃ পরঃ সদা।

এ চেতনাও বাংলাকাব্যে এই প্রথম।

বীরাঙ্গনা কাব্যে মধুসূদন নারীকে তার নিজস্ব মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। মহাভারতের পরিচিত নারী চরিত্র এ নয়। নীলধ্বজকে জনার তীব্র তিরস্কার স্বজনদ্রোহীর প্রতি এক নারীর তিরস্কার—

হায় রে কি পাপে
রাজ শিরোমণি নীলধ্বজ আজি
নতশির, হে বিধাতঃ, পার্থের সমীপে?

বীরাঙ্গনা কাব্য মধুসূদন উৎসর্গ করেছেন বিদ্যাসাগরকে যিনি সমাজের সহস্র বন্ধন থেকে মুক্ত করে নারীকে তার নারীত্বের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। মধুসূদনের হাতে জনার নারীত্বও মর্যাদা, বেদনা ও বীর্যে সুপ্রতিষ্ঠিত।

রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় একদিকে যেমন সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের জন্য 'বিদ্যাসাগর' উপাধি পেয়েছিলেন, অন্যদিকে তেমনি ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে ইউরোপীয় সাহিত্য দর্শন ও ইতিহাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন। বিদ্যাসাগরের মধ্যে অপরিসীম পাণ্ডিত্যের সঙ্গে অপরিমেয় করুণার যোগ হওয়ায় একদিকে তাঁর দৃষ্টি যেমন বৈজ্ঞানিক এবং প্রগতিশীল, অন্যদিকে তাঁর হৃদয় তেমনি মানবচেতনায় উদ্বেল। ভারতীয় সংস্কৃতির মধ্যে যা মহৎ তার সঙ্গে তিনি সমন্বিত করেছিলেন ইউরোপীয় সভ্যতায় য মানবিক। বাঙালী মানসকে সমস্ত কুসংস্কার থেকে মুক্ত করে আধুনিকতার দিগ্দর্শন তাকে যেমন দিয়েছিলেন, সমাজের অজ্ঞতা, ভীরুতা ও দাসত্ব মনোভাবের অবসান ঘটিয়ে সমাজকে তেমনি মানবমুখী করে তুলতে চেয়েছিলেন। নারীকে সামাজিক বন্ধন থেকে মুক্ত করার জন্য জীবনপণ সংগ্রামে তিনি অবতীর্ণ হয়েছিলেন। বিদ্যাসাগরের হাতে বাংলা গদ্য একদিকে যেমন যুক্তি ও বিচারনিষ্ঠ, বক্তব্যে ঋজু, অন্যদিকে তেমনি শব্দের সুষম ও সুবিন্যস্ত প্রয়োগে কাব্যগুণান্বিত। ভাষাকে বিদ্যাসাগর আড়ম্বরপূর্ণ পাণ্ডিত্যময় শব্দ বিন্যাস থেকে মুক্ত করেছিলেন যেমন, তার প্রকাশ ভঙ্গিকে সুসংযত, সহজরূপ দিয়ে তেমনি হৃদয়গ্রাহ্য করেছিলেন। কিন্তু সে ত' গেল কর্মের কথা বাংলাসাহিত্যে দেশাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের অবতারণাও তিনি করেছিলেন তাঁর 'বিধবা বিবাহ' গ্রন্থে। ইতিপূর্বে রামমোহন ও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার 'সতীদাহ' সম্পর্কে যে প্রবন্ধগুলি লিখেছিলেন, সেগুলির ভাষা বক্তব্য প্রকাশের বাহনমাত্র ছিল। কিন্তু বিদ্যাসাগরের হাতে গদ্য তাঁর বক্তব্যকে মানুষের কাছে যেমন পৌঁছিয়ে দিল, প্রকাশভঙ্গির গুণে তেমনি কাব্য সুষমায় মণ্ডিত হয়ে উঠল। উদাহরণ দিই—

"ধন্য রে দেশাচার! তোর কি অনির্বচনীয় মহিমা! তুই তোর অনুগত ভক্তদিগকে, দুর্ভেদ্য দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ রাখিয়া কি একাধিপত্য করিতেছিস? তুই ক্রমে ক্রমে আপন আধিপত্য বিস্তার করিয়া শাস্ত্রের মস্তকে পদার্পণ করিয়াছিস, ধর্মের মর্মভেদ করিয়াছিস, হিতাহিতবোধের গতিরোধ করিয়াছিস, ন্যায় অন্যায় বিচারের পথ রুদ্ধ করিয়াছিস।"......

আর একটি

"হা ভারতবর্ষ! তুমি কি হতভাগ্য! তুমি তোমার পূর্বতন সন্তানগণের আচারগুণে পুণ্যভূমি বলিয়া সর্বত্র পরিচিত হইয়াছিলে; কিন্তু তোমার ইদানীন্তন সন্তানেরা, স্বেচ্ছানুরূপ আচার অবলম্বন করিয়া, তোমাকে যেরূপ পুণ্যভূমি করিয়া তুলিয়াছেন, তাহা ভাবিয়া দেখিলে সর্বশরীরের শোণিত শুষ্ক হইয়া যায়।"

"বিধবা বিবাহ"-র রচনাকাল ১৮৫৫। মধুসূদন "মেঘনাদবধ কাব্য" লেখেন ১৮৬১ সালে। তার দশ বছর পরে বিদ্যাসাগর আর একটি গ্রন্থ লিখলেন "বহু বিবাহ"। এই দুটি গ্রন্থে তিনি সমাজের সামনে তুলে ধরলেন নারীর দুঃসহ যন্ত্রণাকে। মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেন তার মুক্তির দাবিকে, তার স্বাধিকারবোধকে।

নারীর হৃদয়ের কথাকে সাহিত্যের উপজীব্য করে তোলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে প্রথম (১৮৭৩) তিনি বিধবা বালিকা কুন্দর প্রেমার্ত হৃদয়ের বেদনার ছবি আঁকলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগরের সংস্কারমুক্ত মন বা করুণাঘন হৃদয় কোনোটাই তাঁর ছিলনা। বিষবৃক্ষের কুন্দ এবং 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর রোহিনী—দুজনকেই অসামাজিক প্রেমের প্রায়শ্চিত্ত করতে হল প্রাণ দিয়ে। গল্পের পরিবেশ রচনা ও পরিণতি লেখকের ইচ্ছানুযায়ী ঘটে থাকে তাহলে বলা যেতে পারে ষোড়শ শতকের স্মার্ত রঘুনন্দনের মত বঙ্কিমচন্দ্রও প্রায়শ্চিত্ত বিধান দিলেন বিধবা নারীর জীবনে প্রেম আসার মত পাপের জন্য। শিল্পী বঙ্কিম পরাভূত হলেন রক্ষণশীল বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে।

বিধবা নারীর ও যে হৃদয় আছে এবং সে হৃদয়ে যে আবেগের জোয়ার ভাটা খেলে, তার স্বীকৃতি প্রথম পাওয়া গেল শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে। বিধবা রমা ও সাবিত্রী, পতিতা রাজলক্ষ্মী ও চন্দ্রমুখী কুলত্যাগিনী কিরণময়ী ও অভয়া— প্রত্যেকটি চরিত্রেই বিকশিত হয়েছে নারীসত্তা। প্রেমে, ত্যাগে ও মহত্বে শরৎচন্দ্রের নারীচরিত্র উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

কিন্তু হৃদয় থাকা সত্বেও বীর ছিল না শরৎচন্দ্রের। ছিল না বিধাহীন জীবন-স্বীকৃতি। তাঁর ভীরু মনের সামনে বারবার এসে দাঁড়িয়েছে সমাজ। তাই ওপরের একটি চরিত্রও জীবনদীপ্তিতে ভরে উঠতে পারেনি। শিল্পীর বেদনা ও মুক্তদৃষ্টি থাকা সত্বেও সংস্কার মুক্ত মন, বা বীর্যঘন হৃদয় কোনোটাই তাঁর ছিল না। কুন্দ রোহিনীদের মতো রমা সাবিত্রীকেও অপেক্ষা করতে হল মানবদরদী লেখকের লেখনীর নির্ভয় সহৃদয়তার জন্য।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মানুষের মনকে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করলেন; সে মানুষ বিধবা নারী হলেও। সমাজকে অস্বীকার না করেও নারীর অকুণ্ঠ জীবন বেদনাকে সসম্ভ্রমে রূপায়িত করেছেন শরৎচন্দ্র। তাঁর হাতে পতিতা নারীও নারী। রমা, কিরণময়ী, সাবিত্রী এবং অভয়ার মত চরিত্রগুলি তিনি করুণায় বিকশিত করে তুলেছেন। এক অকল্পনীয় মহত্বে পরিপূর্ণ নারীসত্তায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তাঁর সুমিত্রা এবং কমল।

তবু শরৎচন্দ্রের নারী চরিত্রের সামনে বারবার এসে দাঁড়িয়েছে সমাজ। শিল্পীর বেদনা এবং মুক্তদৃষ্টি থাকা সত্ত্বেও শরৎচন্দ্র সমাজের কাছে মাথা নিচু করেই থেকেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথে নারী চরিত্র বিশ্বের নারীসত্তা। তার প্রেম যেমন অকুণ্ঠ তার ত্যাগও তেমনি মহিমাময়। চোখের বালির "বিনোদিনী" রবীন্দ্রনাথের উদার ও মানবিক দৃষ্টির ফসল।

মানুষের জীবন মধ্যযুগীয় সংস্কারপন্থীদের হাতে ধর্মীয় অনুশাসনের এবং লোকাচারের অজস্র বন্ধনে অনড় হয়ে পড়েছিল। কিন্তু বৈজ্ঞানিক গতিবাদ সেই জীবনকে সকল সংস্কার থেকে যেমন মুক্ত করেছে, সত্য ও কল্যাণবোধের শাশ্বত পথ থেকেও তেমনি বিচ্ছিন্ন করেছে। উদাহরণ: 'শেষ প্রশ্ন'র কমল। ক্ষণিকবাদের দর্শনে কমল চরিত্রকে অবাধ ও দুর্বার করে তুলতে চেয়েছিলেন শরৎচন্দ্র, কিন্তু জীবনের মূল্যবোধ না থাকায় কমল তার পরম সার্থকতাকে লাভ করতে পারে নি। জীবন যে শুধু উল্কার গতি নয় এবং পাথরের স্থিরতাও নয়, জীবন যে তার চলিষ্ণুমন এবং কল্যাণবোধে দীপ্ত হৃদয়—এই উভয়ের সমন্বয়, একথাই তাঁর 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে ব্যক্ত করেছেন রবীন্দ্রনাথ।

ভাবতে আশ্চর্য বোধহয়, যে, বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাসাগরই প্রথম সচেতন ব্যক্তিত্ব, যিনি নারীর সর্বাঙ্গীন অধীনতার বন্ধন মুক্ত করতে জীবনব্যাপী সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছেন। তাঁর 'বহুবিবাহ' গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন—"স্ত্রীজাতি অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও সামাজিক নিয়মদোষে পুরুষ জাতির নিতান্ত অধীন। এই দুর্বলতা ও অধীনতা নিবন্ধন তাঁহারা পুরুষ জাতির নিকট অবনত ও অপদস্থ হইয়া কালহরণ করিতেছেন।"

ইউরোপে হেনরিক ইবসেন তাঁর Doll's House" গ্রন্থে নারীর বিদ্রোহকে সুস্পষ্ট রূপ দিলেন। তাঁর 'নোরা' দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করলো—"সবার আগে আমি নারী।" এই অকপট আত্মঘোষণা, প্রচলিত সংস্কার ও প্রথা থেকে নিজেকে মুক্ত করে বীর্য্য ও জীবনধর্মের সঙ্গে সমন্বিত করা, অপরূপ বিন্যাসে রূপ পেল রবীন্দ্রনাথে। চিত্রাঙ্গদা দয়িত অর্জুনকে বললেন—

"পূজা করি মোরে রাখিবে ঊর্ধ্বে সে নহি নহি,
হেলা করে মোরে রাখিবে পিছে সে নহি নহি।
যদি পার্শ্বে রাখো মোরে সংকটে সম্পদে
সম্মতি দাও যদি কঠিন ব্রতে সহায় হতে
পাবে তবে তুমি চিনিতে মোরে।"

রবীন্দ্রনাথের পূর্বে বাংলা সাহিত্যে নারীর এই আত্মঘোষণা আর শোনা যায় নি।

রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের ধর্মে দীক্ষা পেয়েছিলেন পিতা দেবেন্দ্রনাথের কাছে। তিনি জেনেছিলেন, জীবনদেবতাকে—

আমি জেনেছি তাঁহারে
মহান্ত পুরুষ যিনি আঁধারের পারে
জ্যোতির্ময় ;

তবু কোন্ মুহূর্তে বুদ্ধের জীবনদ্যুতি এসে প্রবেশ করলো তাঁর অন্তরে। পলকে তাঁর হৃদয় উদ্ভাসিত হয়ে গেল মানব প্রেমে। তাঁর এই নতুন উপলব্ধিতে ধরা পড়ল 'কি গভীর দুঃখে মগ্ন সমস্ত আকাশ'। তিনি নিজেকে ডেকে বললেন—

বড়ো দুঃখ বড়ো ব্যথা, সম্মুখেতে কষ্টের সংসার
বড়োই দরিদ্র শূন্য, বড়ো ক্ষুদ্র বদ্ধ অন্ধকার।

কবি অনুভব করলেন

স্বার্থমগ্ন যে জন বিমুখ—
বৃহৎ জগৎ হতে, সে কখনো শেখেনি বাঁচিতে

চির আচরিত, প্রাণহীন শাস্ত্রশাসন এই মানবধর্মের কাছে একেবারেই তুচ্ছ মূল্যহীন।

মালিনী নাটিকায় রাজমহিষীর প্রশ্ন—

ধর্ম জানে ব্রাহ্মণে কেবল ?
আর ধর্ম নাই ?

যেন কবিরই অন্তরের প্রশ্ন। সুপ্রিয়র কণ্ঠে তার উত্তর—

যজ্ঞে যাগে তপস্যায় কভু মুক্তি নয়—
মুক্তি শুধু বিশ্ব কাজে

'বিসর্জন' নাটকে এবং 'রাজর্ষি' উপন্যাসে কবিচেতনা আরও স্পষ্ট এবং গভীর। ব্রাহ্মণ ও শাস্ত্রজ্ঞ পুরোহিত রঘুনাথের সকল শাস্ত্রজ্ঞান, সংস্কার ও অহংকারকে চূর্ণ করে জেগে উঠলো প্রেম এবং প্রাণাবেগ। সামাজিক ক্রূড়তা ও হিংস্রতাকে পরাভূত করে উদ্বোধন ঘটলো মনুষ্যত্বের।

এই মনুষ্যত্ব কোন বিশেষ ধর্মমতের সংকীর্ণতায় বাঁধা নয়। 'ন্যাশনালত্বের চেয়ে মনুষ্যত্ব বড়ো'—এ কথাই বলতে চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। ভারতীয় প্রজ্ঞা ও সহনশীলতা এবং ইউরোপের জীবনচাঞ্চল্য ও বিজ্ঞাননিষ্ঠা—এই দুইয়ের সমন্বয়ই ছিল তাঁর আদর্শ। তাই অত্যন্ত রক্ষণশীল মনোভাবাপন্ন হিন্দু 'গোরার' পায়ের

আঃ মাঃ ও বিদ্যাসাগর—5

তলা থেকে একদিন মাটি সরে গেল। হঠাৎ এক রূঢ় আঘাতে ভেঙে গেল তার ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের মহিমা। গোরা উপলব্ধি করল সে হিন্দু নয়, খৃষ্টানও নয়। সে কোন বিশেষ ধর্মের বা সম্প্রদায়ের একজন নয়। সে শুধু মানুষ। মনুষ্যত্বই তার ধর্ম।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশকে ফরাসী বিপ্লব যেমন সমগ্র ইউরোপকে আলোড়িত করেছিল, বর্তমান শতকের দ্বিতীয় দশকে তেমনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং রাশিয়ার বিপ্লব সমগ্র বিশ্বকেই নাড়া দিল। মানুষের চিরকালের নীতিবোধ এবং জীবনচেতনা আর একবার ধাক্কা খেল। ভেঙে গেল তার ভৌগলিক সীমা ; তার দৃষ্টির সামনে প্রসারিত হ'ল এক জগৎ, সে জগৎ ধর্মহারা, বিত্তহারা, নিরন্ন ও নির্যাতীত মানুষের।

সেই বঞ্চিত মানবতার বিকৃতজীবনের নগ্ন পরিচয় রূপায়িত হল কল্লোলযুগের শৈলজানন্দ, প্রেমেন্দ্র মিত্র ও মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখনীতে। এ যুগের ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রত্যক্ষ করেছেন—"মানুষের সনাতন জীবন-মুক্তির সাধনা।" যে মানুষ ভয়ের বন্ধন, ক্ষুদ্রতার গণ্ডি, অভাবের পীড়ন, জীবনে জোর করে চাপানো সকল প্রকার প্রভাবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে চলেছে" সেই মানুষের জীবনমুক্তি।

নদী স্রোতস্বতী বলেই বয়ে যায়। তার দুইপারে কখনো জাগে সবুজ ফসলের সমারোহ, কখনো আবার উষর বালুচর। সমৃদ্ধ জনপদকে সে যেমন সৃষ্টি করে, নির্জন শ্মশানকেও সে তেমনি ধরে রাখে। কিন্তু নদী কোনখানেই থেমে থাকে না। এগিয়ে চলাই নদীর ধর্ম।

তেমনি এগিয়ে চলে শিল্পী মানুষের সৃজনশীল চেতনা।

এই চেতনাই তাকে অন্ধকার থেকে—আলোকের পথে নিয়ে যায় ; মুক্ত করে তাকে প্রাত্যহিক মালিন্য ও দীনতার ক্লেদ থেকে। সে প্রার্থনা করে :

> দূর করো চিত্তের দাসত্ববন্ধ
> ভাগ্যের নিয়ত অক্ষমতা,
> দূর করো মূঢ়তায় অযোগ্যের পদে
> মানব মর্যাদা বিসর্জন,
> চূর্ণ করো যুগে যুগে স্তূপিকৃত লজ্জারাশি
> নিষ্ঠুর আঘাতে।
> নিঃসঙ্কোচে মস্তক তুলিতে দাও
> অনন্ত আকাশে
> উদাত্ত আলোকে
> মুক্তির বাতাসে।

শিক্ষা

পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ্ সপ্তম শতাব্দীতে ভারত ভ্রমণে আসেন। বিহারের নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি দীর্ঘকাল অবস্থান করেছিলেন। তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্ত থেকে আমরা সে যুগের ভারতবর্ষের উন্নত ও উদার শিক্ষা-ব্যবস্থার বিবরণ পাই। হিউয়েন সাঙ্ লিখে গেছেন, যে নালন্দা প্রধানতঃ মহাযানপন্থী বৌদ্ধদের শিক্ষাকেন্দ্র ছিল; কিন্তু তাঁদের মধ্যে ধর্মান্ধতার কোন স্থান ছিল না। শিক্ষার বিষয়ে কোন সঙ্কীর্ণতা কোথাও ছিল না।

প্রাচীন ভারতবর্ষের শিক্ষা ও সংস্কৃতির বর্ণনা দিতে গিয়ে **F. H. Thomas** লিখেছেন—**There is no country where the love of learning had so early an origin or has exercised so lasting and powerful an influence.'**[১]

সত্যানুসন্ধান এবং সত্য ও সুন্দরের আরাধনার ওপরেই ভারতের শিক্ষার আদর্শ প্রতিষ্ঠিত ছিল। শিক্ষার এই আদর্শকে যে কি প্রবল গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় বৃহদারণ্যক উপনিষদে। খৃষ্টজন্মের অন্ততঃ হাজার বছর পূর্বে রচিত এই আরণ্যকের একটি কাহিনী—

শোকতপ্ত নারদ এসেছেন সনৎকুমারের কাছে উপদেশ নিতে। সনৎকুমারের প্রশ্নের উত্তরে নারদ বলছেন—"আমি ঋগ্বেদ যজুর্বেদ, অথর্ববেদ ইতিহাস, পুরাণ, ব্যাকরণ, গণিতবিদ্যা, দৈবৎবিদ্যা, নিধিবিদ্যা, তর্কশাস্ত্র, ব্রহ্মবিদ্যা, দেবজনবিদ্যা অবগত আছি।"[২]

ছান্দোগ্য উপনিষদের একটি কাহিনী নিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ব্রাহ্মণ' কবিতাটি রচনা করেছেন। গুরু গৌতম শিক্ষালোভী তরুণ সত্যকামকে বলছেন—

বৎস, শুধু ব্রাহ্মণের আছে অধিকার ব্রহ্মবিদ্যালাভে

কিন্তু সত্যকাম গণিকাপুত্র। সে অকপটে সত্যকে প্রকাশ করলো—ব্রহ্মর্ষি গৌতমের চরণে। আর গৌতম যিনি ঋষি এবং শিক্ষাগুরু, তিনি

বাহু মেলি বালকেরে করি আলিঙ্গন
কহিলেন, 'অব্রাহ্মণ নহ তুমি তাত,
তুমি দ্বিজোত্তম, তুমি সত্যকুলজাত।

শিক্ষার ক্ষেত্রে এই উদার মানসিকতার অবসান ঘট্‌ল বাংলায় সেন বংশের রাজত্বকালে। বল্লাল সেনের আমলে ব্রাহ্মণ্য শক্তির প্রকাশ প্রবল হ'য়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে জাতিভেদের গোঁড়ামি শুরু হয়ে যায়। সংস্কৃত-সাহিত্য এবং ধর্ম ও

দর্শন তখন উচ্চবর্ণের মানুষের সমাজেই আবদ্ধ হতে শুরু করে। শূদ্র অর্থাৎ অব্রাহ্মণ বা অপাংক্তেয় মানুষের জন্য প্রাকৃত ভাষা। তুর্কী সুলতানদের আমলে উচ্চাভিলাষী বাঙালী যেমন ইসলাম ধর্মের দিকে আকৃষ্ট হয়েছিল, তেমনি ফারসি ভাষার দিকে। ফারসি রাজভাষা হওয়ায় শিক্ষার মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতবর্ষ এবং বাংলাদেশে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক চরম দীনতা দেখা দিল। মক্তব ও মাদ্রাসায় ছাত্রদের পড়তে হ'ত কোরানের সঙ্গে গুলিস্তাঁ ও লায়লা মজনু। হিন্দুদের শিক্ষাপদ্ধতিতে দুটি সুস্পষ্ট ভেদরেখা। সাধারণ মানুষের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা, পড়তে হ'ত পৌরাণিক কাহিনী ও দেবদেবীর গল্প। উচ্চশিক্ষা শুধু ব্রাহ্মণের জন্য। পাঠ্য ছিল—ব্যাকরণ, কাব্য, পুরাণ ও স্মৃতি, এবং তর্কশাস্ত্র। উচ্চ-শিক্ষার্থীরা দর্শন, জ্যোতিঃশাস্ত্র এবং তন্ত্রচর্চার কিছু সুযোগ পেত।

বই ছিল না। পুঁথি পড়বার বা পড়াবার সৌভাগ্য সকলের ছিলনা। গুরু তাঁর স্মৃতি থেকে যা মুখস্থ বলতেন, ছাত্ররা তাই লিখত তাল পাতাতে। গুরু বলতে প্রাচীন ভারতের সেই স্বার্থশূন্য, দারিদ্রব্রতী সাধকপুরুষ তখন আর নেই। সমাজের সংস্কারে আচ্ছন্ন, অল্পশিক্ষাসম্বল অভাবী বা দীন মনোভাবাপন্ন শিক্ষক। তাদের ছিল না মুক্ত উদার দৃষ্টি কিম্বা জ্ঞানের গভীরতা। শিক্ষার উদ্দেশ্য যেমন অর্থকরী, বিষয়ও তেমনি। উপরন্তু পৌরাণিক সংস্কারে সৃষ্ট কিছু মঙ্গলকাব্য বা পাঁচালি জাতীয় লেখা। 'There was nothing in this system of instruction which could awaken and expand the mind of the young scholars and free it from the trammels of mere usage'.

ষোড়শ শতাব্দীতে লেখা মুসলমান যুগের রক্ষণশীল স্মার্ত পণ্ডিতদের কিছু রচনাও তখন ছাত্রদের পাঠ্য। এই রচনাগুলি ধর্ম ও সমাজ সম্পর্কে নানারকম বিধিনিষেধ ছাড়া আর কিছুই না। আর ন্যায় ও দর্শন যা শুধু ব্রাহ্মণ এবং সীমিত কিছু শিক্ষার্থীর কাছে শুধু অধিগম্য ছিল, তার মধ্যে আধুনিক চিন্তাধারার কোন প্রতিফলন ছিল না। পশ্চিম পৃথিবী বিজ্ঞান ও সমাজ দর্শনের চিন্তায় যে বিপ্লব এনেছিল, ভারত ও বঙ্গদেশ তার থেকে অনেক দূরে ছিল। ছাত্রদের মধ্যে স্বাধীন চিন্তার কোন সুযোগ ছিল না। এই পৃথিবী বা জীবন সম্বন্ধেও তাদের বৈরাগ্যের দৃষ্টি। কারণ, বেদান্তদর্শনের শঙ্কর ভাষ্যে ইহজীবন 'মায়া'রূপে বর্ণিত। সমাজ ও শিক্ষাচিন্তার এই স্থবিরতা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগের বঙ্গদেশকে কিভাবে প্রাণশক্তিহীন এক জড়বস্তুতে পরিণত করেছিল, তার কিছু পরিচয় আমরা পাই ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের Glimpses of Bengal in the Nineteenth Century গ্রন্থে—

"While the world outside had made rapid progress in different branches of secular learning during the preceding two hundred years, India practically stood still where it was six hundred years ago."

বাংলার শিক্ষা ও সমাজ জীবনে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন দেখা দিল, যেদিন ভারতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে ইংরাজী শিক্ষা ও ইউরোপীয় সংস্কৃতির যোগাযোগ ঘটলো।

ইংরাজ এদেশে এসেছিল বণিকরূপে। বাঙালীর দুর্বল সমাজ জীবন ও অসংহত রাষ্ট্রব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে তারা একদিন গোটা বাংলা এবং তারপরে ভারতবর্ষই দখল করে বসলো। সেদিন ইংরাজ বণিকের লোভ এবং মীরজাফর ও তার আমলাতন্ত্রের নপুংসক চরিত্র গোটা দেশটায় যেরূপ দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও অরাজকতার সৃষ্টি করেছিল, তার তুলনাও ইতিহাসে নেই। কিন্তু ওয়ারেন হেষ্টিংস্ গভর্ণর রূপে তাঁর শাসন নীতিতে ভারতীয়তাকে প্রাধান্য দিলেন। হেষ্টিংসের কথা হ'ল, কোম্পানীর কর্মচারীদের ভারতীয় ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হতে হবে এবং ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধার মনোভাব পোষণ করতে হবে। হেষ্টিংস একদিকে যেমন ইংরাজ সিভিলিয়ানদের ভারত চর্চার নির্দেশ দিয়েছিলেন, অন্যদিকে তেমনি কিছু পণ্ডিতদের সুযোগ দিয়েছিলেন, যাতে তাঁরা কলকাতায় এসে ভারতীয় শিক্ষা ও ঐতিহ্যকে নতুন করে জাগিয়ে তুলতে পারেন। ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে ছাপার অক্ষরে মুদ্রিত হালহেড এর বাঙলা ব্যাকরণ বাংলা শিক্ষার জগতে এক নতুন দিগ্ দর্শন।

কোম্পানীর কর্মচারীরূপে কলকাতায় এসে সেদিন যাঁরা ভারতচর্চায় মন দিয়েছিলেন, তাঁদের কয়েকজন ভারতবিদ্যাবিদ্ পণ্ডিত – ভারতের উজ্জ্বল অতীতের গৌরবকে আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছিলেন। তাঁরা মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করলেন বই ছাপাবার জন্যে, ব্যাকরণ তৈরী করলেন ভাষাকে সংহত করতে, বাংলায় শিক্ষার জন্য চেষ্টা শুরু করলেন বাঙালী মনকে সচেতন করে তুলতে।

১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে উইলিয়াম জোন্সের চেষ্টায় কলকাতায় প্রাচ্য বিদ্যাচর্চার কেন্দ্ররূপে এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হল। ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে সোসাইটির সভায় জোন্স্ হিন্দুজাতির ইতিহাস ও সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা করলেন। কালিদাসের শকুন্তলা এবং জয়দেবের গীতগোবিন্দও তিনি ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করলেন।

পঞ্চানন কর্মকারকে দিয়ে উইলকিন্স প্রথম বাংলা হরফ তৈরী করালেন, যার ফলে হ্যালহেড্ এর লেখা ব্যাকরণ বই হিসাবে ছাপা গেল। উইলকিন্স গীতারও

ইংরাজী অনুবাদ করলেন। কিন্তু বাংলার শিক্ষা সংস্কৃতির ইতিহাসে তাঁর সবচেয়ে বড় দান ইংরাজীতে সংবাদপত্র প্রকাশ। ১৭৮০তে প্রকাশিত Hickey's Gazetteই এদেশের প্রথম সংবাদপত্র। প্রথম বাংলা সংবাদপত্র সমাচার দর্পণ বার হয় ১৮১৮তে মার্সম্যান এর সম্পাদনায়।

হিন্দুধর্ম ও মনীষার গৌরবকে আবিষ্কার করার জন্য যাঁরা চেষ্টা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে কোলব্রুকের নামও স্মরণযোগ্য। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে রামমোহন কলকাতায় আসার অনেক আগেই তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় 'বেদ' সম্বন্ধে দীর্ঘ গবেষণামূলক একটি প্রবন্ধ লেখেন।

এ কথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই, যে হিন্দুধর্ম ও সমাজের কূপমণ্ডুকতার গণ্ডি ভেঙে যে প্রবল স্রোত সেদিন শিক্ষিত বাঙালীর মানসিকতায় আছড়ে পড়েছিল তার মূলে ছিল ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে ইংরাজী শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংঘাত। আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্যের গৌরবকে বিস্মৃতির অতল থেকে তুলে ধরল বিদেশী পণ্ডিতেরাই। স্কুল স্থাপন করে বাংলা ও ইংরাজী শিক্ষার ধারাকে যুক্ত করে শিক্ষার গতি পরিবর্তন করালো ইংরাজ সিভিলিয়ানরা। শুধু মুদ্রন ব্যবস্থার প্রবর্তন নয়, বাংলা ভাষার বনিয়াদও তারাই তৈরি করে দিল।

ভারতীয় সংস্কৃতিও ইউরোপীয় সংস্কৃতির মধ্যে মিলনের সূত্র গড়ে তুলেছিল ১৮০০ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত ফোর্ট ইউলিয়াম কলেজ। বস্তুতঃ এই কলেজকে কেন্দ্র করেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষাবিদদের মিলন ঘটেছে। এই কলেজেই প্রাচীন ভারতবর্ষের উজ্জ্বল অতীতকে আবিষ্কারের প্রথম চেষ্টা করা হ'য়েছে।

হেষ্টিংসের নীতির অনুসরণে ওয়েলেসলী এই কলেজের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর যে সকল কর্মচারী কলকাতায় আসছিলেন, তাঁদের ভারতীয় ভাষা ও সংস্কৃতিতে পারদর্শী করে তুলবার জন্যে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে ইংরাজ শিক্ষাবিদ্ এবং হিন্দুপণ্ডিতদের একত্র সমাবেশ ঘটায় শিক্ষিত বাঙালী মানসে এক প্রবল ভাবাবেগ দেখা দিয়েছে। তাছাড়া এই কলেজ প্রেস স্থাপন করে, বই ছাপিয়ে, ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক আলোচনার সূত্রপাত করে এবং সমাজ ও ধর্মনীতির আলোচনার ক্ষেত্রকে সম্প্রসারিত করে এমন একটি পরিবেশ তৈরি করতে পেরেছিল, যার ফলে বাঙালীর শিক্ষা ও সংস্কৃতির জগতে একটি নতুন দিগন্ত সূচিত হ'য়েছিল।

এতদিন যারা সংস্কৃত, ফারসী ও আরবি ভাষায় শিক্ষালাভের জন্য ব্যস্ত ছিল, এবারে তাদের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষায় আগ্রহ দেখা গেল। কারণ ইউরোপীয় বাণিজ্যিক সংস্থাগুলিতে চাকরি পেতে হ'লে এবং ইংরাজ রাজপুরুষদের সঙ্গে

শিখতে হলে ইংরাজী জানার প্রয়োজন। তাছাড়া বিভিন্ন মিশনারী সংস্থাগুলি ততদিনে স্কুল স্থাপন করেছে, বই ছাপিয়ে বিতরণ করেছে, এবং শিক্ষার প্রসারের জন্য আন্তরিক চেষ্টা শুরু করেছে। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে দিনাজপুরে এবং তারপরে বিভিন্ন স্থানে অনেকগুলি স্কুল স্থাপন করেছেন উইলিয়াম কেরি। কেরি ও মার্শম্যান —দুজনেই বাংলাভাষায় শিক্ষাদানের পক্ষপাতী ছিলেন; কিন্তু ইউরোপীয় পদ্ধতিতে এবং আধুনিক বিজ্ঞান ও গণিত বিদ্যায় তাঁরা শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন।

১৮১৫ খৃষ্টাব্দে রামমোহন কলকাতায় এলেন। তার আগেই শিক্ষাকে তার প্রাচীন কূপমণ্ডুকতার গণ্ডি থেকে মুক্ত করে আধুনিক ধারার মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য বাঙালী ও ইউরোপীয় মিশনারী—দুই তরফের লোকই সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। রক্ষণশীল হিন্দু পরিবারের প্রতিনিধি রাধাকান্ত দেব শিক্ষার প্রসার ও আধুনিকিকরণের ব্যাপারে আশ্চর্য উদার ছিলেন। তিনি মিশনারী শিক্ষাব্রতীদের উদ্যমকে স্বাগতঃ জানান। ১৮১৭তে হিন্দু কলেজ স্থাপনের জন্য অনেক টাকা দান করেন তাঁর পিতা গোপীমোহন দেব। রাধাকান্ত দেব প্রথম থেকে এই কলেজের গভর্ণিংবডির সভ্য। ইউরোপীয় পদ্ধতিতে পরিচালিত এবং ইংরাজী ভাষায় সাহিত্য দর্শন ও বিজ্ঞান চর্চার জন্য সমগ্র ভারতবর্ষে হিন্দু কলেজই প্রথম। আরও উল্লেখযোগ্য যে, হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার ব্যাপারে ইংরাজ শিক্ষাবিদ্দের সঙ্গে রাধাকান্ত দেব, দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রমুখ হিন্দু নেতারা যুক্তভাবেই কাজ করেছিলেন।

শুধু হিন্দু কলেজ নয়, ১৮১৭তেই স্কুল বুক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয় ছাত্রদের উপযোগী বই ছাপাবার জন্য। এর মধ্যেও ছিলেন রাধাকান্ত দেব। পরের বছর যখন 'কলিকাতা স্কুল সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হ'ল, তখনও দেখা গেল রাধাকান্ত দেবকে হ্যারিংটন, কেরি ও ডেভিড হেয়ারের সঙ্গে। উচ্চশিক্ষা, ইংরাজী ও আধুনিক শিক্ষার প্রসারের জন্য এদেশে যাঁরা কাজ করেছেন, তাঁদের মধ্যে রাধাকান্ত দেবের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়।

রামমোহন রায় ইউরোপীয় বিজ্ঞান-শিক্ষা এবং ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্তনের জন্য সচেষ্ট ছিলেন, একথা না বললেও চলে। কিন্তু একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠা, বেদান্ত দর্শনের পুনরুদ্ধার এবং ব্রহ্মোপাসনার ক্ষেত্রে তাঁকে যতখানি সক্রিয় হতে দেখা গিয়েছে অন্যত্র ততখানি নয়। তবুও সংস্কৃত ও ফারসির বদলে আধুনিক ইউরোপীয় শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য তাঁর যে ঐকান্তিক আগ্রহ ছিল, তার প্রমাণ ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড আমহার্স্টকে লেখা তাঁর শিক্ষা সংক্রান্ত চিঠিটি।

ইংরাজী শিক্ষা ও সংস্কৃতি বাঙালীমানসে যে নতুন ভাবধারা বহন করে এনেছিল, সেই ভাবধারায় পুষ্ট হ'য়েছিল মোটামুটি এক শ্রেণীর মানুষ, যারা এই কলকাতা শহরের অধিবাসী এবং সাহচর্য পেয়েছিল শিক্ষাবিদ্ ইউরোপীয় পণ্ডিতদের। ব্রিটিশ শাসন যন্ত্র তার নিজের প্রয়োজনেই গড়ে তুলেছিল কলকাতা শহরকে। হেষ্টিংসের শাসননীতির দূরদর্শিতা এই শহরে ভারত বিদ্যাপথিক ইউরোপীয় সুধী এবং সংস্কৃতজ্ঞ হিন্দু পণ্ডিতদের সমাবেশ ঘটিয়েছিল। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার এবং কেরির মত সুপণ্ডিত ও মানবিক চেতনাসম্পন্ন মানুষের সমন্বয় ঘটেছিল। ফলে কলকাতার পরিবেশ এক নতুন চেতনার উন্মেষের সহায়ক হ'য়ে উঠেছে। বাঙালীসমাজে এমন একটি আধুনিকমন্য শ্রেণী গড়ে উঠেছে, যারা শিক্ষার ক্ষেত্রে নতুন বিপ্লব ঘটাতে সচেষ্ট হ'য়েছে।

হিন্দু কলেজে যদিও ইউরোপীয় শিক্ষাপদ্ধতিকেই গ্রহণ করা হয়েছিল, তবুও শিক্ষার ভিত্তিভূমিতে রাখা হ'য়েছিল ভারতীয় দর্শন ও সংস্কৃতিকে। কিন্তু কলেজের পরিবেশ ও শিক্ষার ধারার প্রচণ্ড পরিবর্তন ঘট্‌লো ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে শিক্ষক-রূপে ডিরোজিওর আবির্ভাবের পর। ডিরোজিওর মধ্যে ভারতীয় ঐতিহ্য ও দর্শনের কোন প্রেরণা ছিল না। উপরন্তু তিনি প্রবলভাবে ইউরোপীয় ছিলেন। তাঁর চিন্তাধারা পাশ্চাত্যমুখী এবং বিদ্রোহাত্মক। তবু তাঁর কাব্যপ্রীতি, মানবতাবাদে প্রত্যয়, এবং প্রচণ্ড জীবনী শক্তি ছাত্রদের এমন অভিভূত করেছিল, যে, তারা হিন্দুধর্ম ঐতিহ্য ও সমাজকে ভেঙে এক নতুন চিন্তাধারার মধ্যে আশ্রয় নিতে চাইল। এরা বাংলা ও বাঙালী সমাজকে পুরানো সংস্কারের দুর্গ থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিল বলেই এদের 'নব্যবঙ্গের দল' বলা হয়। এদের অনেকেই হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতিকে ত্যাগ করে খৃষ্টধর্ম ও ইউরোপীয় সংস্কৃতির দিকে ঝুঁকেছিল; তবু উত্তেজনার প্রথম ঝোঁক কমে যাওয়ার পরে তারা দেশ ও সমাজকে নতুনভাবে দেখবার চেষ্টা করেছে।

ডিরোজিও ও তাঁর অনুগামী 'নব্যবঙ্গ দল' এর হিন্দুবিদ্বেষ, রামমোহন অনুগামী ব্রহ্মবাদী সমাজের বৈদিক ঐতিহ্য ও বেদান্তের প্রতি অনুরাগ এবং রাধাকান্ত দেব ও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত রক্ষণশীল অথচ শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদের সংঘর্ষে কলকাতা তথা বাঙালীমানস যখন উত্তাল এবং অস্থির; হিন্দু কলেজ ও সংস্কৃত কলেজ একই ভবনের দুই প্রান্ত থেকে দুই বিপরীতমুখী সংস্কৃতির চর্চায় যখন মগ্ন,— ঠিক তখনই যেন ঐতিহাসিক প্রয়োজনে আধুনিক শিক্ষার ইতিহাসে সবচেয়ে প্রবল এবং বৈপ্লবিক এক ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সেই ব্যক্তিত্ব।

তিনি প্রাচ্য মনীষা এবং পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান, হিন্দু ঐতিহ্য এবং ইউরোপীয় গতিবাদ, ভারতীয় জীবন দর্শন ও ফরাসী মানবতাবাদের মধ্যে সমন্বয় ঘটালেন। তাঁর দুর্বার ব্যক্তিত্বকে সঞ্চারিত করে শিক্ষার জগতে আধুনিক মানসিকতার যে পরিচয় তিনি দিলেন, এই সংস্কার জর্জর দেশের মানসিকতায় তাকে অভিনব বলা চলে।

১৮৪১ খৃষ্টাব্দের ২৯শে ডিসেম্বর তারিখে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে প্রধান পণ্ডিতরূপে যোগদান করেন একুশ বছর বয়সের এক তরুণ—নাম ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (বন্দ্যোপাধ্যায়)। ১৮৪১ থেকে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের ৫ই ডিসেম্বর অর্থাৎ সংস্কৃত কলেজে স্থায়ীভাবে যোগদানের পূর্ব পর্যন্ত নয় বছরকে তাঁর কর্মজীবনের প্রস্তুতিপর্ব বলা যায়। শিক্ষা জগতের সংস্কারক এবং বাংলা ও ভারতবর্ষে আধুনিক শিক্ষা-প্রবর্তনের অগ্রদূতরূপে বিদ্যাসাগরের প্রথম আবির্ভাব ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের ১৬ই ডিসেম্বর—সংস্কৃত কলেজ পুনর্গঠন সংক্রান্ত তাঁর প্রস্তাব রচনার মুহূর্তে।

শিক্ষার সঠিক নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে গভর্ণমেণ্ট তখনো দ্বিধাগ্রস্ত। হেষ্টিংস ও ওয়েলেসলির পোষকতায় কোলব্রুক বা হোরেস উইলসনের মতো পণ্ডিতেরা চেয়েছিলেন। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য এবং প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতিকে জাগিয়ে তুলতে। ১৮২৪ সালে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার সময়েও শিক্ষা পরিষদের সভাপতি উইলসন সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে ইউরোপীয় বিজ্ঞানচর্চাকে যুক্ত করে দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে উইলিয়াম বেন্টিক এদেশে গভর্ণর হয়ে আসার পর থেকে প্রাচীন বৈদিক ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে সরকারী ধারণার পরিবর্তন ঘটতে থাকে। বেন্টিক জেমস্ মিলের ছাত্র। মিল বলেছিলেন—হিন্দুধর্ম, শিক্ষা ও সংস্কৃতির মূলে কুসংস্কার আর পুরোহিততন্ত্রের প্রভাব ছাড়া আর কিছুই নেই। প্রাচ্যবিদ্যার মহত্বকে পুনরুজ্জীবিত করার প্রচেষ্টাকে ব্যঙ্গ করে ঐতিহাসিক ট্রিভেলিয়ান বলেছিলেন—এ শুধু মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চারের চেষ্টা। শিক্ষাবিদ্ মেকলে এই সময়েই ভারতে এসেছিলেন। শিক্ষার নীতি সম্পর্কে তাঁর উক্তি সেদিন এদেশে প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল। মেকলে বলেছিলেন—ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে সার কিছুই নেই। কাজেই ভারতীয়দের শিক্ষিত করে তুলতে হ'লে ইংরাজী ভাষাকেই শিক্ষার বাহন করতে হবে। মেকলে আরও বলেছিলেন, যে, শুধু ভাষা নয়, ইংরাজী সভ্যতা—ইংরাজী জীবনধারা, পোষাক-পরিচ্ছদ ও চিন্তার মধ্যেই ভারতীয়দের মুক্তি।

শুধু কেরি ও মার্শম্যান প্রথম থেকেই বলে আসছিলেন, যে, দেশীয় ভাষাই গণশিক্ষার বাহন হওয়া উচিত। এবং একমাত্র গণশিক্ষার মাধ্যমেই জাতির সংস্কার মুক্তি ঘটে। বেন্টিকের শিক্ষানীতির সঙ্গে একমত হ'তে পারেননি হোরেস

উইলসনও। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ড থেকে একটি চিঠিতে রামকমল সেনকে তিনি লিখেছিলেন—"It (English) should be extensively studied, no doubt, but the improvement of the native dialects enriching them with Sanskrit terms for English ideas must be continued, and to effect this, Sanskrit must be cultivated as well as English."

সংস্কৃত কলেজ সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের প্রস্তাব উইলসনের চিন্তাধারার বাস্তব রূপায়ণ মাত্র নয়, শিক্ষাকে মনুষ্যত্বের বিকাশের পথরূপে গড়ে তোলার সার্থক প্রচেষ্টাও। এই প্রস্তাবে তিনি প্রাথমিক স্তরে বাংলা ও সংস্কৃত শিক্ষার ওপরে জোর দিয়েছেন। তারপরে ইংরাজী ভাষা ও বিজ্ঞান শিক্ষার বিষয়ে তাঁর মনোযোগকে নিবদ্ধ করেছেন। অগ্রসর ছাত্রদের কাছে ভারতীয় ও ইউরোপীয় দর্শনকে একই সঙ্গে তুলে ধরার প্রস্তাব দিয়েছেন। উদ্দেশ্য—সত্যানুসন্ধিৎসু শিক্ষার্থী যেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনকে তুলনা করে নিজের স্বাধীন চিন্তাকে গড়ে তুলতে পারে।

"Thus they they shall have an ample opportunity of comparing the systems of philosophy of their own with the new philosophy of the Western world."

শিক্ষাবিষয়কে প্রস্তাবের পেছনে তাঁর যে সমগ্র চিন্তা কার্যকরী ছিল, তার কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায় ডঃ মোয়াট্‌কে লেখা তাঁর চিঠি থেকে। এই চিঠিতে ডঃ ব্যালেন্টাইনের প্রস্তাবগুলিকে প্রত্যাখ্যান করতে গিয়ে বিদ্যাসাগর বলেছেন—

"What we require is to extend the benefit of education to the mass of the people. Let us establish a number of vernacular schools···let us raise up a hand of men···they should he perfect masters of their own language, possess a considerable amount of useful information and be free from the prejudices of their country."

হিন্দু সংস্কৃতি শিক্ষা ও সমাজ চিন্তার সর্বত্র প্রগতির প্রতিবন্ধকরূপে দাঁড়িয়েছিল যে দুর্ভেদ্য সংস্কার, যে বিশ্বাস অন্ধ ও যুক্তিহীন আবেগের প্রাবল্যে আধুনিক জগৎ থেকে বাংলা ও ভারতবর্ষকে সরিয়ে রেখেছিল, সেই সংস্কার এর বিরুদ্ধেই ছিল তাঁর সংগ্রাম। বিদ্যাসাগর জেনেছিলেন যে, বাংলা শিক্ষার মাধ্যমে জাতীয় মানসকে যদি সক্রিয় ও সজাগ করে তুলতে পারা যায়, এবং পশ্চিমের আধুনিক চিন্তাধারার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে তোলা যায়, তবেই জাতীয়মানসের মুক্তির পথ মিলতে পারে।

পণ্ডিতদের শাস্ত্র ব্যাখ্যা ও তত্ত্ব-মীমাংসার সঙ্গে সামঞ্জস্য ঘটিয়ে আধুনিক শিক্ষার গোঁজামিল যে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় গতিবেগ আনতে পারবে না, এ সত্য অনুভব করেই তিনি ব্যালেন্টাইনের সমন্বয় বা দুই ধারার মিলনের প্রস্তাবকে উড়িয়ে দিয়ে বলেছিলেন—"They are a body of men whose long standing prejudices are unshakeable."

শিক্ষার ক্ষেত্রে মনের আদিম সংস্কারের কোন অস্তিত্বকে মেনে নিতে তিনি রাজি ছিলেন না। পরিপূর্ণ আধুনিক ও মুক্ত মন, এবং স্বাধীন চিন্তা সম্পন্ন এক সমাজ সৃষ্টির আদর্শ বোধ থেকেই তিনি বলেছিলেন—

"I shall be able if supported and encouraged by the Council, to furnish you with a body of youngmen who will be better qualified···to disseminate widely among the people more sound information than it has hitherto been possible."

সমাজ সচেতনতা, ও প্রগাঢ় দূরদর্শিতার সঙ্গে মানবিকতার বোধ ও প্রবল আত্মপ্রত্যয়ের সমন্বয় ঘটেছিল বিদ্যাসাগর চরিত্রে। তাই অতীতের প্রতি কোন মমতা বিভ্রান্ত করতে পারে নি তাঁর চরিত্রের গতিশীলতাকে। অন্ধ বিশ্বাস, নির্বোধ সংস্কার এবং লোকাচারের প্রতি যুক্তিহীন আনুগত্য একটা গোটা জাতকে কিভাবে পঙ্গু করে দেয়, তা প্রত্যক্ষ করেছিলেন বলেই তিনি সংস্কৃত কলেজে তাঁর নতুন শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন এমনভাবে করতে চেয়েছিলেন যাতে—"···every qualified student will be found free from all prejudices of his countrymen."

(অর্থাৎ) শিক্ষাপ্রাপ্ত প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীই তার দেশবাসীর সব কিছু আচার ও সংস্কার থেকে মুক্ত হয়ে উঠেছে—দেখতে পাওয়া যাবে।

অতীতের মোহ থেকে মুক্ত করে, সংস্কারের সমস্ত বাঁধন সরিয়ে বাঙালীর চেতনাকে তিনি মুক্তির আলোকে জাগ্রত করেছিলেন। মানব সমাজের অগ্রগতির সবটুকু প্রাপ্যই যেন বাঙালীও গ্রহণ করতে পারে—এই ছিল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবন সাধনা।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা শিক্ষার ক্ষেত্রে আধুনিকমনস্কতার যে সূচনা দিয়েছিল পরবর্তীকালে তার প্রভাব সমগ্র ভারতবর্ষের ওপরেই পড়েছে। শিক্ষার প্রয়োজন মানুষের অন্তর্নিহিত মনুষ্যত্বকে মুক্ত ও বিকশিত করার জন্য—এই বোধই হ'ল আজ পর্যন্ত আধুনিকতম।

[দুই]

বাংলাভাষা ও বাঙালীর শিক্ষাব্যবস্থার নীতি নির্ধারণের ব্যাপারে ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম সবার আগে স্মরণ করতে হয়। রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে বলেন —"যিনি লোকাচার রক্ষক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বংশে জন্মগ্রহন করিয়াছিলেন, তিনি লোকাচারের একটি সুদৃঢ় বন্ধন হইতে সমাজকে মুক্ত করিবার জন্য সুকঠোর সংগ্রাম করিলেন, এবং সংস্কৃতবিদ্যায় যাঁহার অধিকারের ইয়ত্তা ছিলনা, তিনিই ইংরাজী বিদ্যাকে প্রকৃতপ্রস্তাবে স্বদেশের ক্ষেত্রে বদ্ধমূল করিয়া রোপন করিয়া গেলেন।"

এই একটি উক্তির মধ্যে শুধু বিদ্যাসাগর চরিত্রের মূল্যায়ন নয়, তৎকালীন শিক্ষার আদর্শ সম্পর্কেও রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য মূল্যবান হ'য়ে উঠেছে। রামমোহন বেদান্ত ও ইংরাজির প্রসার একই সঙ্গে চেয়েছিলেন। শিক্ষাবিদ হোরেস উইলসনও প্রাচ্যদর্শন ও পাশ্চাত্য পদ্ধতির মধ্যে মিলন ঘটাবার পক্ষপাতী ছিলেন। বিদ্যাসাগর বাঙালী সমাজের পুনর্জাগরনের চিন্তা হৃদয়ে রেখেই শিক্ষাকে সংস্কারমুক্ত এবং গতিশীল করার কাজে ব্রতী হ'লেন।

বিদ্যাসাগর শিক্ষাকে কোন বিচ্ছিন্ন দৃষ্টি দিয়ে দেখেননি। বাঙালী ও ভারতীয় সমাজের পুরো আধুনিকিকরণ তাঁর লক্ষ্য ছিল বলে, তিনি শিক্ষার নীতিতে গতির সঞ্চার করতে চেয়েছিলেন। তাঁর এই চিন্তা থেকেই তিনি প্রাথমিক পর্য্যায়ে বাংলা ও সংস্কৃত শিক্ষার ওপর জোর দিয়েছেন। তারপরে ইংরাজী ভাষা ও বিজ্ঞান শিক্ষার বিষয়ে মনোযোগ নিবদ্ধ করেছেন। বলাবাহুল্য সংস্কৃত কলেজ পুনর্গঠন সম্পর্কিত রিপোর্টেই তাঁর শিক্ষানীতিকে দৃঢ়ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়েছেন। ছাত্রদের যুক্তি ও বিচার বোধকে জাগ্রত করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল বলেই দর্শন ও সাহিত্যে তুলনামূলক পাঠক্রমের নির্দেশ দিয়েছেন। সংস্কারাচ্ছন্ন সমাজচিন্তার ধারাকেই তিনি বদলে দিতে চেয়েছেন। এ'ব্যাপারে কোন আপোষ মূলক নীতি বা সরকারী হস্তক্ষেপকে তিনি গ্রাহ্য করেননি।

বিদ্যাসাগরের পর এদেশে বাংলা ভাষা, ও বাঙালীর শিক্ষা সম্বন্ধে এবং শিক্ষার উদ্দেশ্য ও নীতি নিয়ে প্রাণমন নিয়োগ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কবি রবীন্দ্রনাথের খ্যাতিকে অতিক্রম করে আচার্য রবীন্দ্রনাথের খ্যাতি দূরদেশে গিয়ে পৌঁছেছিল। তাঁর শিক্ষার আদর্শ বিশ্বজনকে আকৃষ্ট করেছিল বিশ্বভারতীর প্রাঙ্গনে। তবে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আলোচনা শুরু করার আগে আমরা ভারত-

চিন্তার অন্যতম পথিকৃৎ গান্ধীর শিক্ষা চিন্তাকে তুলে ধরতে পারি। কারণ, অনুরূপ আলোচনা আমাদের আলোচনায় ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক হবে।

গান্ধীর মতে জাতীয় শিক্ষার চরিত্র ধর্ম হবে—

১। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা

২। অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা

৩। শিক্ষাকে সরকারী নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত রাখা

৪। শিক্ষাস্থল ও গৃহের পরিবেশের মধ্যে সমতারক্ষা করা।

গান্ধী মনে করেছেন, যে, সরকারী ডিগ্রী লাভের মোহ আমাদের মধ্যে দাস মনোভাবের সৃষ্টি করেছে। দৈহিক শ্রমের মূল্য ও সম্মান সমাজে যতদিন না প্রতিষ্ঠিত হ'চ্ছে, ততদিন সমাজে মানুষের স্বাধীনতা নেই। গান্ধী আরও ভেবেছেন যে, মাতৃভাষা শিক্ষার বাহন না হ'লে সমাজের দরিদ্র, অবহেলিত, অজ্ঞ এবং কৃষিজীবি মানুষের সঙ্গে শহরের মানুষের ভেদ কখনো ঘুচবেনা। ইংরাজী শিক্ষা সমাজে এই ভেদ সৃষ্টি করেছে।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দীর্ঘ বিতর্কের পর গান্ধীজি মেনে নেন, যে, ইংরাজী ভাষার চর্চা ছাড়া শিক্ষার প্রসার এবং মানসিক প্রগতির পথ মুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। কারণ শুধু ভারতবর্ষ যে বহুভাষী দেশ তাই নয়, পৃথিবীর অন্যান্য অগ্রগামী এবং গতিশীল দেশের সঙ্গে ভাব ও চিন্তার আদানপ্রদান একমাত্র ইংরাজী ভাষার মাধ্যমেই সম্ভব।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবি; ছোটগল্প, উপন্যাস, রূপক নাটক, প্রবন্ধ সাহিত্য এমন কি সঙ্গীতজগতে তাঁর প্রতিভার তুলনা নেই। অথচ শিক্ষার নীতি নিয়েই তিনি শুধু ব্যস্ত হ'লেন না, আদর্শ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার কাজেও আত্মনিয়োগ করলেন। এর কারণ তাঁর মধ্যে স্বদেশ চেতনা অত্যন্ত প্রবল ছিল। তাঁর প্রথম জীবনে শিক্ষার্থী হিসাবে তিনি জানতে পেরেছিলেন, যে, শিক্ষার পরিবেশ সমাজ-পরিবেশ থেকে স্বতন্ত্র এবং শিক্ষাব্যবস্থায় বৃত্তিগত বা কারিগরি কাজের যোগ নেই। তিনি দেখেছিলেন, যে, উচ্চাশিক্ষা নাগরিক পরিবেশে আবদ্ধ। অথচ প্রাচীন ভারতের শিক্ষাব্যবস্থায় মানুষকে তার সহজ ও স্বাভাবিক পরিবেশের মধ্যেই জ্ঞান লাভের সুযোগ দেওয়া হ'ত।

রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন—"বিপুলসংখ্যক গ্রাম নিয়ে আমাদের দেশ" তিনি তাই 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধে বললেন—

"আমাদের এই শিক্ষার সহিত জীবনের সামঞ্জস্য সাধনই এখনকার দিনের সর্বপ্রধান মনোযোগের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।"

১৯০১ খৃষ্টাব্দে বীরভূমের একটি নিভৃত গ্রাম বোলপুরের একপ্রান্তে আরণ্যক পরিবেশের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ স্থাপন করলেন তাঁর শিক্ষাকেন্দ্র। তাঁর অনুগত ও গুণমুগ্ধ ব্যক্তিরা তাঁর সঙ্গে এলেন। সবুজ শাল শিরিষ ও ছাতিম গাছের ছায়ায় দিগন্তবিস্তৃত মাঠকে চোখে রেখে জেগে উঠল একটি বিদ্যালয়—শান্তিনিকেতন; লাল মাটি আর খোয়াই ভেঙ্গে বয়ে যাওয়া নদী কোপাই, যার তীরে তীরে সাঁওতাল পল্লী। শান্তিনিকেতনের আদর্শ হ'ল প্রাচীন ভারতীয় জীবনধারার সঙ্গে আধুনিক ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মিলন। বর্জন নয়, গ্রহন। সকল ধর্ম ও সকল দেশের মানুষের মিলন ক্ষেত্র।

কবির শিক্ষানীতি ও শিক্ষার আদর্শ সম্পর্কে সঠিক ধারণা করতে হ'লে, আমাদের মনে রাখতে হবে, যে, তিনি একদিকে যেমন প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্যে ও জীবনাদর্শে নিজেকে ভূষিত করেছিলেন, অন্যদিকে তেমনি ইউরোপের নবমানবতাবাদে এবং বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিবিদ্যার প্রসারে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। তিনি শিক্ষাক্ষেত্রকে তাই সর্বমানবের মিলন ক্ষেত্র রূপে গড়ে তুলতে চাইলেন। প্রথম মহাযুদ্ধের ভয়াবহতা যখন দিগন্ত আচ্ছন্ন করলো, তখন কবিও বিশ্বপরিক্রমা করে ফিরে এলেন তাঁর শান্তিনিকেতনে। এবারে প্রতিষ্ঠা হ'ল বিশ্বভারতীর, যার আদর্শ—

Visva-bharati acknowledges India's obligation to offer to others the hospitability of her best culture and India's right to accept from others their best.

শিক্ষার পরিবেশকে কৃত্রিমতা থেকে মুক্ত করে জীবনের সঙ্গে যুক্ত করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। কিন্তু আধুনিকতাকে তিনি গ্রহণ করতে চেয়েছেন সেই অর্থে যেখানে আধুনিকতা বিশ্বজনীন ভাবাদর্শের পথে মানুষকে নিয়ে যায়। কবির কথায় বিদ্যানিকেতন হ'বে এমন একটি তীর্থ, যেখানে।

"দিবে আর নিবে
মিলাবে মিলিবে
যাবেনা ফিরে..."

শিক্ষার পদ্ধতিতে জীবনের রস এবং জীবিকার বৃত্তি দুইয়েরই যোগ থাকবে বলেই শান্তিনিকেতনে একদিকে সঙ্গীত, অঙ্কন, ভাস্কর্য, সাহিত্য ও কাব্য যেমন প্রাধান্য পেয়েছে, আর একদিকে তেমনি চাষের কাজ, কারু কলা, সমবায় নীতি এবং কুটির শিল্পের মিলন ঘটানো হ'য়েছে। জাতিভেদ, শ্রেণীভেদ, প্রভৃতিকে তুলে দিয়ে সকল মানুষের তীর্থভূমি করা হয়েছে এই বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বভারতীকে।

রবীন্দ্রনাথ যখন বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা করেন, তখনো ভারতের রাজনীতিতে গান্ধীর প্রবেশ ঘটেনি। তাঁর উদার ও সমন্বয়ী দৃষ্টিতে কবি জেনেছিলেন—"পূর্বদেশের মানুষ আজ আর শুধু পূর্বেই বদ্ধ নয়, পশ্চিমের জ্ঞানকেও সে আপনার বলে গ্রহন করতে ব্যগ্র।" তবু মহাযুদ্ধের ভয়াবহতা দেখে কবি শঙ্কিত হ'লেন এবং শান্তিনিকেতনের পরিবেশে বিশ্ব মানবের স্বরূপকে প্রতিষ্ঠিত করতে ব্যস্ত হলেন। সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদ, ধর্মান্ধতা ও সংস্কারাচ্ছন্নতা থেকে মনুষ্যত্বকে তিনি মুক্তি দিতে ব্যগ্র হ'লেন।

স্বদেশ ও স্ব সমাজকে জানতে হ'লে চাই স্বদেশী ভাষা কিন্তু সর্বদেশ ও সর্বমানুষকে জানতে হ'লে ভাবের আদান প্রদান করতেই হবে। তার বাহন বিদেশী ভাষা। অর্থাৎ শিক্ষার বাহন যদি হয় মাতৃভাষা শিক্ষার প্রসার ঘটবে ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে!

রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন শিক্ষার ক্ষেত্রে মিলন ঘটাতে। প্রাচ্য-দেশের আধ্যাত্মিক চেতনার সঙ্গে পাশ্চাত্যের আধিভৌতিক চিন্তার মিলন। "শিক্ষার উদ্দেশ্য বিচ্ছিন্নতা নয়, ঐক্য।······জ্ঞানের তপস্যায় মনকে বাধা মুক্ত করতে হয়।" প্রকৃত শিক্ষাকে তাই সংস্কারমুক্ত হ'তে হ'বে।*

* শেষের অংশটুকু মূল বক্তৃতায় ছিল না

জাতীয়তার চেতনা

'শিবাজী উৎসব' কবিতায় শিবাজীকে স্মরণ করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

মারাঠার কোন শৈলে অরণ্যের অন্ধকারে বসে

হে রাজা শিবাজী,—

তব ভাল উদ্‌ভাসিয়া এ ভাবনা তড়িৎ প্রভাবৎ

এসেছিল নামি—"

"এক ধর্মরাজ্য-পাশে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত

বেঁধে দিব আমি।"

ধর্মের বন্ধনে সমগ্র ভারতবর্ষকে এক মহারাজ্যরূপে গড়ে তুলবার কোন পরিকল্পনা শিবাজীর ছিল কিনা, আমাদের জানা নেই; কিন্তু ইতিহাস আমাদের বলে যে, ভারতবাসীর মনে কোন ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রচেতনা কোনদিন ছিল না। খণ্ড খণ্ড বহুধা বিচ্ছিন্ন এই দেশে কোন অখণ্ড মৈত্রীবন্ধন কোনদিনই গড়ে ওঠেনি। পরাক্রান্ত পাঞ্জাব, জাঠ, রাজপুত বা মারাঠারা পরস্পরের দিকে সন্দেহ ও বিদ্বেষের দৃষ্টিতেই তাকিয়েছে। বাংলা. কলিঙ্গ বা কাশ্মীর আপন আপন স্বাতন্ত্র্য রক্ষাতেই ব্যস্ত থেকেছে। কিন্তু কেউ নিজেদের ভারতীয় বলে ভাববার প্রেরণা অনুভব করেনি। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি নিয়ে যে, এক মহারাজ্য গড়ে উঠতে পারে—এ' চেতনা যেমন কারও ছিল না, হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ মিলে যে এক মহাজাতি হ'তে পারে, এ চিন্তাও তেমনি কারও আসে নি। আসলে আমাদের ভৌগলিক জ্ঞান এতই সংকীর্ণ ছিল যে, দেশের গণ্ডি পেরিয়ে মহাদেশের কথা আমরা ভাবিনি।

এই না ভাবার জন্য চরম মূল্য আমাদের দিতে হয়েছে। আমাদের বিচ্ছিন্নতার সুযোগ নিয়ে বাইরে থেকে এদেশের সম্পদ লুঠ করতে এসেছে তুর্কী, মোগল ও তাতার দস্যুরা; এসেছে পর্তুগীজ, ওলন্দাজ এবং ইংরাজ বণিকেরা। একদিন তুর্কী ও মোগল এদেশ দখল করে যেমন বুকের ওপর বোঝা হ'য়ে বসেছিল, ইংরাজও তেমনি ভারতবর্ষকে পদানত করে শাসনের যন্ত্রে শোষণ করেছে।

হিন্দু রাজাদের মধ্যে দেশচেতনা যেমন ছিল না তেমনি ছিল না স্বাধীনতার জন্য দুর্বার আকাঙ্খা। ছিল না বলেই আমরা রাজস্থানের অতি ক্ষুদ্র এক রাজ্য মেবারের রাণা প্রতাপসিংহকে উদাহরণ স্বরূপ তুলে ধরবার চেষ্টা করি। স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রতাপসিংহের সংগ্রাম এবং মুসলমান অধীনতা স্বীকার না করার জন্য

শিবাজীর লড়াই—কোনটার মধ্যেই অখণ্ড জাতীয়তার বোধ প্রকাশ পায়নি। দু'একটি বিক্ষিপ্ত ঘটনায় জাতীয় মানসিকতার পরিচয়ও থাকে না।

জাতীয়তা বা ন্যাশনালিজম্-এর বোধ জাগে ধর্ম, ভাষা, অর্থনৈতিক ঐক্য এবং রাষ্ট্রীয় সংহতিকে অবলম্বন করে। স্বাজাত্যবোধের চেতনা মানুষকে তার দেশ ও রাষ্ট্র সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। সে স্বজাতি ও স্বদেশের গৌরবকে সকলের সামনে তুলে ধরবার জন্যে ব্যগ্র হয়ে ওঠে। পরধর্ম ও পরাধীনতা তার মনুষ্যত্বকে আঘাত করে। ভারতের ইতিহাসে এই স্বাজাত্যবোধ এবং স্বদেশপ্রেম অনুপস্থিত ছিল। তাই রাজা মানসিংহ মোঘল সম্রাট আকবরের পায়ে মাথা নিচু করেছে। ভবানন্দ মজুমদার মানসিংহ সমেত মোগল সৈন্যকে বাঙ্গালী প্রতাপাদিত্যের নিধনে গোপনে সহায়তা করেছে। আর বাংলা তথা ভারতীয় সাহিত্য মানসিংহ বা ভবানন্দ মজুমদারকে ঈশ্বরের আশ্রিত বলে প্রচার করতে কুণ্ঠাবোধ করেনি।

ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর 'বাংলার ইতিহাস' গ্রন্থে প্রতাপাদিত্যকে স্বাধীনতাকামী দেশপ্রেমিক রাজা বলে তুলে ধরতে চেয়েছেন। মোগল বাদশাহের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আপন স্বাতন্ত্র রক্ষার জন্য লড়াই করায় প্রতাপাদিত্যকে সাহসী এবং শক্তিশালী বলতে বাধা নেই। কিন্তু দেশাত্মবোধ বা স্বজাতিপ্রিয়তা তাঁর চরিত্রে ছিল এমন পরিচয়ও ইতিহাসে নেই। মোগল বাদশাহ বা তুর্কী সুলতান এবং তাদের সামন্ততন্ত্র এবং স্বেচ্ছাচারী হিন্দু ভুঁইয়া বা রাজাদের অত্যাচারে বিপর্যস্ত সাধারণ মানুষের মনেও স্বদেশপ্রেম গড়ে উঠবার কোন সুযোগ ছিল না। আলীবর্দী, সিরাজ বা নবাবী বাংলার জন্য কোন সহানুভূতি জনমনে থাকলে সেদিন মাত্র কয়েকজন সৈন্য নিয়ে ইংরাজ সেনাধ্যক্ষ ক্লাইভ এদেশ অধিকার করতে পারতো না।

বরং উল্টোটাই বলা যায়। নবাব ও তার আমলাতন্ত্রের অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই পেতে নবাগত ইংরাজ শাসনকে সকলে খুশি মনেই মেনে নিয়েছে। তখনকার দৈনন্দিন বিপর্যয়, নবাব ও তার কর্মচারীদের খামখেয়ালী অত্যাচার, এবং প্রতি মুহূর্তের আতঙ্ক থেকে মুক্তি পাওয়া গেল, এই চিন্তাতেই সকলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে।

ইংরাজকে সাম্রাজ্য গঠনে সেদিন যারা সাহায্য করেছে, বা ইংরাজ শাসনকে এদেশে স্বাগত জানিয়েছে, জনসমাজে তারা অনাদৃত হয়নি। রাজা রামমোহন রায়কে মুক্তি ও স্বাধীনতার প্রথম উদ্গাতা বলা হয়; কিন্তু সেই রামমোহনও ব্রিটিশ শাসনকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন; একটা চিঠিতে তিনি V. Jackmont কে লিখেছেন—

"Conquest is very rarely an evil when the conquering people are more civilized than the conquered because the

former bring to latter the benefits of civilization. India requires many more years of English domination so that she may not have many things to lose……"

রামমোহনের অনুরাগী বন্ধুরা—দ্বারকানাথ ও প্রসন্ন কুমার ঠাকুরও রামমোহনের উক্তির প্রতিধ্বনি করেছেন।

বাঙালী সচেতন হ'ল, তার গৌরবোজ্জ্বল অতীতের ছবি যেদিন তার চোখের সামনে উদ্ভাসিত হল। এশিয়াটিক সোসাইটির ব্রিটিশ প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্ উইলকিন্স' জোন্স ও কোলব্রুক অতীত মন্থন করে আবিষ্কার করলেন প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার মহত্ত্ব। উইলিয়াম কেরি বাংলা ভাষাকে শক্তিশালী ও সম্ভাবনাপূর্ণ বলে তার উন্নয়নে সচেষ্ট হলেন। বাঙালীর হীনমন্যতা কেটে গেল। উজ্জ্বল হ'ল জাতীয় জীবন সম্বন্ধে তার ধারণা। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার সময় ও চেতনার এই ধারাকে বিশ্লেষণ করে লিখেছেন—

"All that could not fail to stir deeply the hearts of the Hindus with the result that they were imbibed with a spirit of nationalism and argent patriotism.

রামমোহন রায়ই প্রথম বাঙালী এবং ভারতীয়, যিনি বৈদিক ভারতবর্ষকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন। রামমোহন একদিকে যেমন বেদান্ত ও অন্যান্য উপনিষদগুলি অনুবাদ করেছেন, আর একদিকে তেমনি ব্রহ্ম ও একেশ্বরবাদের প্রতিষ্ঠা করেছেন। ১৮২৮ সালে হিন্দু কলেজেরই এক ছাত্র ডিরোজিওর হিন্দু-বিদ্বেষে আচ্ছন্ন হ'লেন না। কাশীপ্রসাদ ঘোষ জেম্‌স্ মিলের ঐতিহাসিক গ্রন্থ History of British India-তে প্রচারিত হিন্দু বিরোধী রচনার প্রবল প্রতিবাদ তুললেন। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রামমোহনের আদর্শে বেদ ও বেদান্তের গৌরবকে প্রচার করার ভার নিলেন। ব্রাহ্মসমাজ ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মাধ্যমে ভারতের ঐতিহ্য চেতনাকেই তিনি একটি সংহতরূপে প্রকাশ করতে চাইলেন।

কিন্তু এগুলি বিক্ষিপ্ত ও খণ্ডিত প্রচেষ্টা মাত্র। সাধারণ মানুষের মনে তখনো জাতীয় চেতনা যেমন ছিল না, স্বাজাত্যাভিমানও তেমনি জাগেনি। ইংরাজ রাজপুরুষের সান্নিধ্য তখন সকলের কাছেই কাম্য। ইউরোপীয় পোশাক ও আচরণ এবং ইংরাজী ভাষাই তখন সকলের কাছে অনুকরণীয় হয়ে উঠেছে। যাঁরা অল্প শিক্ষিত তাঁরাও ইংরাজ বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলির সংস্পর্শে আসতে ব্যস্ত। ইংরাজদের কৃপা বা করুণা পাওয়া যাবে, এই চিন্তায় ইংরাজীতে কথা বলা এবং ইংরাজী পোশাকে দুরস্ত হ'য়ে ওঠাই সকলের কাছে আকাঙ্খার বস্তু।

সেই অন্ধ অনুকরণ এবং ঐতিহ্যহীন সমাজজীবনের মাঝখানে প্রবল আত্মমর্যাদা, স্বাদেশবোধ ও স্বাজাত্যাভিমান নিয়ে যিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন তাঁর

বার ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। রবীন্দ্রনাথের ভাষা উদ্ধৃত করে বলি—"বিদ্যাসাগর সাহেবের হস্ত হইতে শিরোপা লইবার জন্ত কখনো মাথা নত করেন নাই।" হিন্দু কলেজের প্রিন্সিপাল কার সাহেবের সামনে চটিশুদ্ধ দুই পা তুলে বসার মত সাহসও সেদিন আর কারও ছিল না। হাতে কাটা সুতোর মোটা ধুতি আর চাদর পরেই তিনি ছোট লাট হ্যালিডের সঙ্গে দেখা করতেন। বিদ্যাসাগরের চটি সেদিন অসাধারণ মর্যাদা পেয়েছিল ; কারণ এশিয়াটিক সোসাইটির হ'লে প্রবেশ করতে গিয়ে চটি ছাড়তে তিনি রাজি হননি। বিদ্যাসাগরই প্রথম বাঙালী এবং ভারতীয় যিনি স্বদেশী পোশাক ও দেশী চটির মর্যাদা রক্ষার জন্ত ব্রিটিশ রাজপুরুষদের সঙ্গে প্রবল বাদ প্রতিবাদে নেমেছেন এবং চটির মর্যাদাকে রাজনৈতিক ইস্যু করে তুলেছেন।

বিদ্যাসাগরের এই প্রখর মর্যাদাবোধ ও স্বদেশী পোশাকের প্রতি নিষ্ঠা সমগ্র জাতিকে যে, প্রেরণা জুগিয়ে ছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাঁর অনুরক্ত সুহৃদ রাজনারায়ণ বসু ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে লিখলেন—Prospectus of a Society for the promotion of national feeling among the educated natives of Bengal. এই গ্রন্থে তিনি বাঙালী জাতিকে আত্ম-সচেতন হতে আহ্বান জানালেন। তিনি প্রস্তাব দিলেন জাতীয় পরিচ্ছদ ও স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের জন্ত।

শুধু বাঙালী নয়, সমগ্র ভারতবাসীর আত্মচেতনা ও জাতীয়তাবোধের সূচনা এই দিন থেকেই এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

রাজনারায়ণ বসু প্রথম প্রস্তাব দিলেন সকলের সামনে জাতীয় পরিচ্ছদ গ্রহণ এবং স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের জন্ত। তাঁর প্রেরণায় গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং নবগোপাল মিত্র ১৮৬৭ সালের ১২ই এপ্রিল চৈত্র মেলার দিন কলকাতার উপকণ্ঠে বেলগাছিয়া ভিলায় হিন্দুমেলার উদ্বোধন করেন। মেলার কার্যবিবরণীতে বলা হয়।

"স্বজাতীয়দের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন করা ও স্বদেশীয় ব্যক্তিগণ দ্বারা স্বদেশের উন্নতিসাধন করাই ইহার উদ্দেশ্য।" (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—জীবন-স্মৃতি (১৩৬২) পৃঃ ১১২ ৪)

ইতিপূর্বেই ১৮৬৫ সালের ৭ই আগষ্ট তারিখে 'ন্যাশনাল পেপার' বার হয়েছে। সম্পাদক নবগোপাল মিত্রর হিন্দুমেলাকেও 'ন্যাশনাল মেলা' নামে অভিহিত করা হয়েছিল। এই মেলাতে জাতীয় শিল্প প্রদর্শনীর (National Industrial Exhibition) প্রথম প্রতিষ্ঠা। "নবগোপালের সময় থেকেই এই 'ন্যাশনাল' শব্দটা দাঁড়াইয়া গেল। ন্যাশনাল সঙ্গীত রচিত হইতে আরম্ভ হইল।" [—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর]। রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুরকে সভাপতি করে 'ন্যাশনাল সোসাইটি' এই সময়েই প্রতিষ্ঠিত হয়। ন্যাশনালিজম বা জাতীয়তার চেতনা এই

সময়েই। এই চেতনার প্রেরণা দিয়েছেন রাজনারায়ণ বসু আর শিক্ষিত বাঙালীর চিত্তে সঞ্চারিত করেছেন নবগোপাল মিত্র।

(দুই)

জাতীয়তা বা ন্যাশনালিজ্‌মের বোধ জাগে ধর্ম, ভাষা, অর্থনৈতিক ঐক্য এবং রাষ্ট্রীয় সংহতিকে অবলম্বন করে। মানুষ তার জাতীয়তার বোধে যখন উদ্দীপ্ত হয়, তখন তার চেতনা জাতীয় সংস্কৃতি ও স্বাদেশিকতার অনুরাগে পূর্ণ হ'য়ে ওঠে। কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাসে রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতার বোধ কোনদিন যেমন পরিস্ফুট হ'তে দেখা যায়নি, উনবিংশ শতাব্দীর আগে ভারতবাসীর মনে স্বাজাত্যবোধ ও স্বদেশপ্রেমও তেমনি কোনদিনই জাগ্রত হয়নি।

বিদেশীয় ভারততত্ত্ববিদ্‌ পণ্ডিতরাই যে আমাদের চেতনাকে উন্মোচিত করেছেন, একথা স্বীকার করতে বাধা নেই। রামমোহন রায়ই প্রথম বাঙালী যিনি বৈদিক ভারতকে তার স্বকীয়তায় প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অনুকরণের বিরুদ্ধে স্বদেশীয় পোষাকের মর্যাদাকে তুলে ধরলেন।

১৮৬৭ সালে নবগোপাল মিত্রের প্রচেষ্টায় জাতীয় মেলার বা হিন্দুমেলা উদ্বোধনের সময় থেকেই যে বাঙালী চেতনায় জাতীয়তা বোধের জাগরণ ঘটল একথা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলে গেছেন। কিন্তু বাঙালীর কাব্য ও সাহিত্যে স্বাদেশিকতা ও দেশাত্মবোধের স্ফুরণ তারও আগে থেকেই ঘটেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি রামনিধি গুপ্ত বা নিধুবাবুর গানের একটি পংক্তিতে যার সূচনা—

"বিনা স্বদেশী ভাষা পুরে কি আশা"

মধুসূদনের মধ্যে তার পরিণতি।

এর আগে স্বদেশ বলে কোন মহিমাময় ভৌগলিক সত্তার চেতনাও যেমন আমাদের ছিলনা, আপন দেশের জন্য বুকের মধ্যে বেদনার কোন ক্রন্দনও আমরা অনুভব করিনি। ভারতবিদ্যাবিদ্‌ ইউরোপীয় পণ্ডিতরাই এই চেতনাকে জাগ্রত করেছেন, একথা অস্বীকার না করাই ভাল।

হিন্দু কলেজের অধ্যাপক ডিরোজিও যাঁর দেহে পর্তুগীজ রক্ত এবং চিন্তায় ইউরোপের সংস্কৃতি, তাঁর কবিতায় যে প্রথম দেশাত্মবোধের সুর শোনা গেল এও এক বিচিত্র ঘটনা। ডিরোজিওর মধ্যে ভারতচেতনা ছিলনা, অথচ ভারতবর্ষকে তাঁর কাব্যে যে ভাবে বেদনা ও প্রেমের মাধুর্যে অভিষেক করেছেন তাতে আশ্চর্য হ'তে হয়। উল্লেখ করতে পারি The Harp of India কবিতাটির—

Why hang'st thou lonely on yon withered bough?
Unstrung, for ever must thou there remain?
Thy music once was sweet who hears it now?
Why doth the breeze sigh over thee in vain?

বিধ্বস্ত অতীতের জন্য যেমন বেদনা, উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্যও তেমনি প্রত্যাশা

Your glories are budding they shall bloom

Patriotism বা স্বদেশপ্রেমের এই চেতনা ডিরোজিও যে ইংরাজী সাহিত্য থেকেই পেয়েছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ১৮২১ সালে গ্রীস তুর্কীর সঙ্গে লড়াই করে তার স্বাধীনতার পুনরুদ্ধার করে। ইংরাজী শিক্ষিত বাঙালীর মনে নিশ্চয়ই তারও রেখাপাত ঘটেছে। ১৮৫৪তে শুরু হয়েছে ইতালীর মুক্তি সংগ্রাম। স্বদেশের মুক্তির জন্য মাৎসিনি, গ্যারীবল্ডী ও কাভুর সশস্ত্র সংগ্রাম ভারতবাসীকে যে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে তার পরিচয় ইতিহাসেই আছে। কিন্তু পরাধীনতার বেদনা বাঙালী কবিকে যে কতখানি উদ্বেল করেছে তার ইঙ্গিত পাওয়া গেল ১৮৫৮ সালে লেখা রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মিনী উপাখ্যান থেকে—

স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে কে বাঁচিতে চায়?

এ ক্রন্দন রাজপুত জীবনের, না ইংরাজপদানত বাঙালী হৃদয়ের?

মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁর মেঘনাদ বধ কাব্য রচনা করলেন ১৮৬১তে। বিভীষণকে তিনি দেশদ্রোহীরূপেই চিত্রিত করেছেন। মেঘনাদের করুণ ভর্ৎসনায় বাঙালী আত্মার মর্মবেদনাই ধ্বনিত

কোন ধর্মমতে কহ দাসে, শুনি,
জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতি—এ সকলে দিলা
জলাঞ্জলি: শাস্ত্রে বলে, গুণবান যদি
পরজন, গুণহীন স্বজন, তথাপি—
নির্গুণ স্বজন শ্রেয়, পরঃ পরঃ সদা।

এই উক্তির মধ্যে জাতীয়তার চেতনা একটি সুস্পষ্ট রূপ পেয়েছে। পরবর্তী কালে নবীনচন্দ্র সেনের কাব্যে পেলাম—

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যচয় করি সম্মিলিত—
এই শৈল প্রাচীরের মধ্য পুণ্যভূমে—
এক মহারাজ্য প্রভু, হয়না স্থাপিত
এক ধর্ম, একজাতি, এক সিংহাসন

১৮৬৮ সালে হিন্দু মেলায় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের যে গানটি গাওয়া হয় দেশাত্মবোধ ও ভারতীয় জাতীয়তার উদ্বোধন ঘটল তাতে—

মিলে সব ভারত সন্তান
একতান মন প্রাণ
গাও ভারতের যশোগান।
হোক ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়
গাও ভারতের জয়,
কি ভয় কি ভয়, গাও ভারতের জয়।

১৮৭০ সালে শোনা গেল হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভারত সঙ্গীত—

বাজ রে বাজ শিঙ্গা বাজ এই রবে—
সবাই স্বাধীন এ' বিপুল ভবে
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়!

নবীনচন্দ্র ভারতবর্ষকে মাতৃমূর্তিতে কল্পনা করেছিলেন—

হে মাতঃ ভারতভূমি! সৃজিলা বিধাতা
মহারাজ্য উপযোগী করিয়া তোমায়।
তুষারকিরীট শুভ্র বিরাট মূরতি
অভ্রভেদী হিমাচল বসিয়া শিয়রে

অবশ্য নবীনচন্দ্রের রৈবতক রচনার অনেক আগেই বঙ্কিমের কমলাকান্ত স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করেছে—

মা যা ছিলেন,
মা যা হইয়াছেন, এবং
মা যা হইবেন।

মধুসূদন যদি জাতীয়তাবোধের প্রথম উদ্‌গাতা হন, তাহলে স্বদেশকে জননীরূপে কল্পনা করার মন্ত্র প্রথম উচ্চারণ করলেন বঙ্কিমচন্দ্র। স্বদেশপ্রেম ও দেশভক্তি তিনি বাঙালীর অন্তরে অন্তরে গেঁথে দিলেন। তিনি বললেন—দেশ মানে মাঠ, বন, নদী সম্পৃক্ত একটি ভৌগলিক সত্তা মাত্র নয়, দেশই আমাদের মা—দশপ্রহরণধারিণী মা। আনন্দমঠের ভবানন্দ মহেন্দ্রকে বললেন—আমরা অন্য মা মানিনা, আমরা বলি জন্মভূমিই মা। দেশকে শত্রুর হাত থেকে মুক্ত করতে এগিয়ে এলেন সত্যানন্দ তাঁর সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী কিন্তু বীর্য্যবান সন্তানদলকে নিয়ে। তাদের কণ্ঠে শোনা গেল বন্দেমাতরম্ গান।

ত্বংহি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী—
কমলা কমলদল বিহারিণী—
নমামি কমলাং অমলাং অতুলাম্
সুজলাং সুফলাং মাতরম্।

বন্দেমাতরম্ (১৮৭৬) গানে দেশকে যেমন জননীরূপে কল্পনা করা হয়েছে, আনন্দমঠ উপন্যাসে (১৮৮২) তেমনি দেশ ও দশপ্রহরণধারিণী দুর্গাকে অভিন্ন বলে প্রকাশ করা হয়েছে। এই যে স্বাদেশিকতা ও জাতীয়তার চেতনা—অনেকে একে হিন্দু জাতীয়তা ব'লে বর্ণনা করতে চেয়েছেন। কারণ হিন্দুসংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে কেন্দ্র করেই এই চেতনার তৎকালীন ব্যাপ্তি।

বঙ্কিমের পথ ধরেই এগিয়ে এলেন স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি উদাত্ত কণ্ঠে

ঘোষণা করলেন—ভারতের মাটি আমার স্বর্গ…বললেন…আগামী পঞ্চাশ বছর আমাদের একমাত্র উপাস্যদেবতা দেশজননী, আমাদের এই ভারতবর্ষ। শুধু দেশ নয়, দেশের অধিবাসী সমগ্র ভারতবাসীই তাঁর চোখের সামনে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠল, 'ভুলিওনা, নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, মুচি-মেথর, তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই।'

জাতির অন্তরে স্বাধীনতার জন্য আগ্রহ এবং নির্ভীকতাও তিনি সৃষ্টি করলেন। উদাত্ত কণ্ঠে সকলকে ডেকে বললেন—

'হায় ভারত, তুমি কি কেবল এই পাথেয় সম্বল করিয়াই সভ্যতা ও মহত্বের উচ্চশিখরে আরোহন করিতে চাও? যে স্বাধীনতা কেবল সাহসী ও বীরেরাই অায়ত্ব করিতে পারে, সেই স্বাধীনতা কি তুমি তোমার লজ্জাকর ভীরুতার দ্বারা লাভ করিতে পারিবে?

পরবর্তী কালে জাতীয়তার বোধে উদ্বুদ্ধ বাঙালী যুবসমাজে বিপ্লবাত্মক কাজের যে জোয়ার বয়ে গেল, এবং দেশের জন্য আত্মদানের যে প্রেরণা দেখা দিয়েছিল স্বামী বিবেকানন্দই যে তার উৎস—এ কথা সিডিসন কমিটির রিপোর্টেই উল্লিখিত হয়েছে। রিপোর্টের ২৪ নং পরিচ্ছেদে বলা হইয়াছে—He preached, that Vedantism was the future religion of the world and that although India was subjected to a foreign power, she must be careful to preserve the faith of mankind. She must seek freedom by the aid of the Mother of Strength.

রিপোর্টের পরবর্তী অংশে বলা হ'য়েছে যে সন্ত্রাসবাদী যুবকেরা বিবেকানন্দের এই উক্তিকে বিকৃত করে তাদের প্রচারের কাজে লাগিয়েছে। রিপোর্টে যাই বলা হোক্ পরাধীনতার যে বেদনা জাতির অন্তরে গুমরে গুমরে উঠেছিল, তাকে দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তার চেতনায় রূপান্তরিত করেছিলেন বঙ্কিম—বিবেকানন্দ। বঙ্কিমের পথ ধরেই অরবিন্দ দেশজননী এবং শক্তির উৎসরূপিনী জননী ভবানীকে এক ও অভিন্ন কল্পনা করলেন। বাংলায় বিপ্লববাদের মূলে ছিলেন—একদিকে বিবেকানন্দশিষ্যা ভগিনী নিবেদিতা অন্যদিকে অরবিন্দ—যতীন্দ্রনাথ। তাঁর ভবানী মন্দির পুস্তিকায় জননীর রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে অরবিন্দ নিজে নিজে লিখেছিলেন—"The infinite energy is Bhavani. She also is Durga……She is our Mother and creatress of us all. In the present age the Mother is manifested as the Mother of strength."

কিন্তু বিবেকানন্দ ও অরবিন্দ এমনকি বঙ্কিমচন্দ্রকেও উত্তীর্ণ হ'য়ে হঠাৎ ঘুমন্ত অগ্নিগিরির বুক বিদীর্ণ করে বাঙালী ও ভারতবাসীর বুকের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয়ের

মন্ত্র বহন করে নিয়ে এল যে সঙ্গীত এবং যে ধ্বনি—তাহ'ল বন্দেমাতরম্। ১৯০৫ সালের বঙ্গবিভাগের প্রস্তাব বাঙালীর হৃদয়ে বিক্ষোভ বেদনার যে ভূমিকম্পন তুলেছিল তারই ফলে সমুদ্র মথিত হ'য়ে উঠে এল সেই অমৃতমন্ত্র যে মন্ত্রকে সম্বল করে দেশ স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পথ অতিক্রম করে পৌঁছাতে পেরেছে বিজয়ের দুর্গতোরণে।

উল্লেখ করা উচিত যে বাঙালী বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ সেদিন যেমন বন্দেমাতরম্ সঙ্গীতে সুর দিয়েছিলেন তেমনি রচনা করেছিলেন সেই স্বদেশী গানগুলি—যা শুধু সেদিন নয় দীর্ঘদিন পরে বাঙলাদেশ এর আত্মচেতনার পথে প্রেরণা হ'য়ে দেখা দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ সেদিন গেয়েছিলেন—

ও আমার দেশের মাটি
তোমার পরে ঠেকাই মাথা

বলেছিলেন

বাংলার মাটি বাংলার জল
বাংলার বায়ু বাংলার ফল
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক……

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নবগোপাল মিত্রের জাতীয় মেলা, রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের উদ্দীপক কাব্যসঙ্গীত, সত্যেন ঠাকুরের হোক্ ভারতের জয় এবং বঙ্কিমের আনন্দমঠ বাঙাল'মানসে জাতীয়তার যে চেতনা এবং দেশাত্মবোধের যে বেদনা সঞ্চাত করেছিল ১৯০৫ সালে বঙ্গ বিভাগ রোধের আন্দোলনে তা সমগ্র জাতির চিত্তকে মহাদেবের শিখামুক্ত ভাগিরথীর মতো এক দুর্বার স্রোতের আবেগে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। পরবর্তীকালে রজনীকান্ত, দ্বিজেন্দ্রলাল ও নজরুলের দেশাত্মবোধক যে কাব্য সঙ্গীত জাতির চিত্তকে উদ্বুদ্ধ করেছে, এমনকি ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষের বন্ধনমুক্তি যে গৌরব ও আত্মশক্তিতে দেশকে প্রতিষ্ঠিত করেছে, তার প্রস্তুতি যে ১৮৬৭ সালের জাতীয় মেলা থেকেই শুরু হ'য়েছে তাতে কোন ভুল নেই।